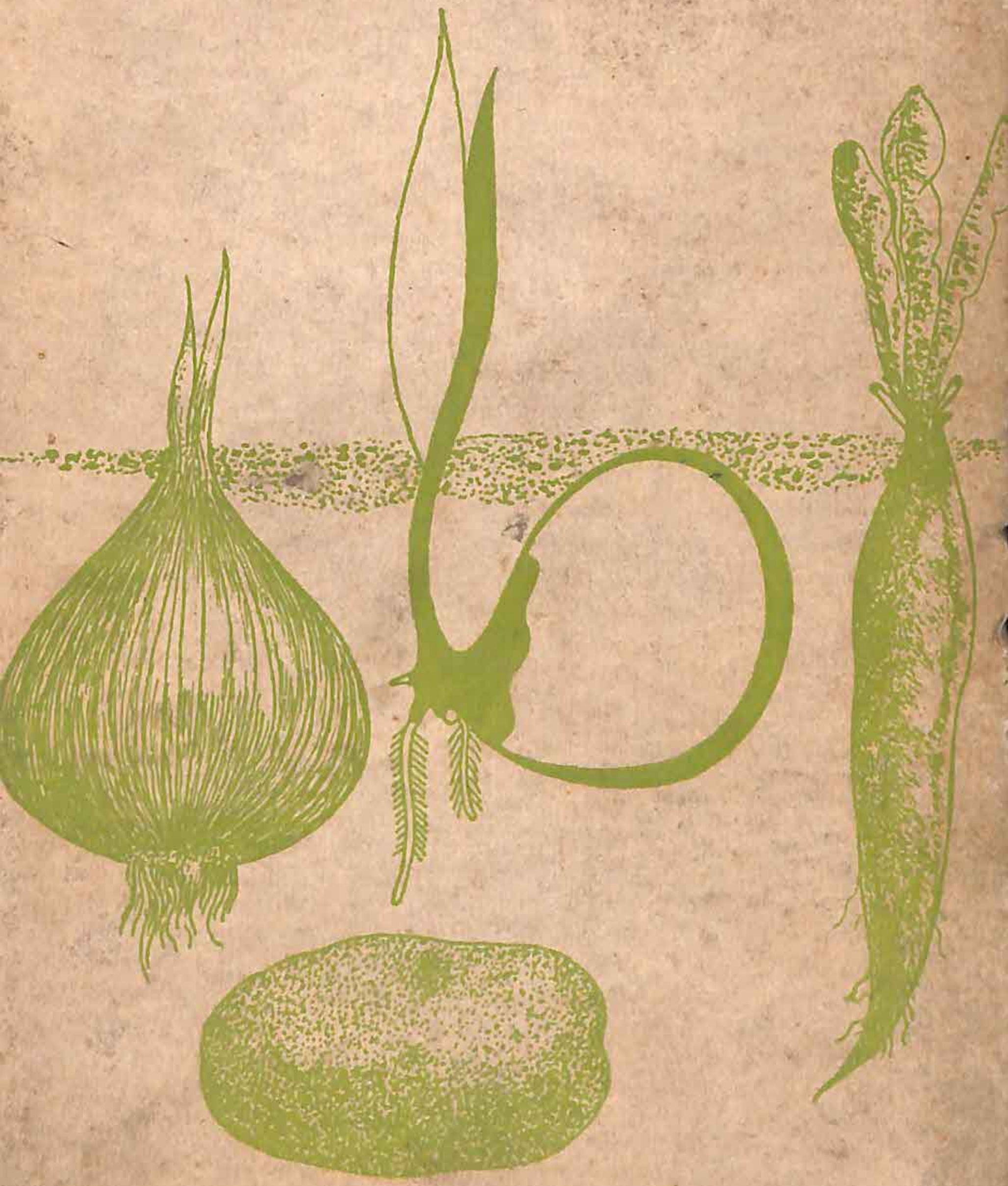
মাটির তলার ফসল



মাটির তলার ফসল

মাটির তলার ফসল

ডক্টর সরিৎরঞ্জন চৌধুরী
বি. এস-সি., বি. এ-জি., এম. এস-সি. (আই. এ. আর. আই.)
পি. এইচ. ডি. (কলিকাতা)

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
(সচিব)
জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

মূল্য ঃ ছয় টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

জননী বসুন্ধরা তার বুকে সমস্ত খাদ্যের উপাদান সঞ্চিত করে রেখেছেন। কিন্তু সেই উপাদান আমরা সরাসরি আমাদের খাবার হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। গাছ তা পারে। মাটি থেকে গাছ তার প্রয়োজন মত খাদ্যের উপাদান টেনে নিয়ে তা দিয়ে তৈরী করে দেয় আমাদের খাওয়ার উপযুক্ত খাবার। সামান্য কয়েকটি জলে জন্মানো গাছ ছাড়া সব ফসলই মাটিতে জন্মায়। সেই সমস্ত ফসলের ফল, পাতা, কাণ্ড বা মূল আমরা খেয়ে থাকি। ফসলের বেশির ভাগ অংশ থাকে মাটির উপরে আবার কিছুটা থাকে মাটির তলায়। অনেক ফসলের মাটির তলায় থাকে শুধু মূল বা শেকড় যা আমরা মোটেই খেতে পারি না। কিন্তু কিছু কিছু ফসলের মাটির তলার অংশই আমরা খেয়ে থাকি। কারণ, এই অংশটা থাকে বেশ শাঁসালো। এখানে এদের নিয়েই আলোচনা করছি। এদেরই বলছি 'মাটির তলার ফসল'। এই মাটির তলার অংশ কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিবর্তিত মূল, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিবর্তিত কাণ্ড।

মাটির তলায় জন্মানো যে সমস্ত ফসলের অংশ আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি, তার মধ্যে প্রথমেই আলুর নাম করতে হয়। আলু ছাড়াও অনেক ফসলের মাটির তলাকার অংশ আমরা সব্জি হিসেবে খেয়ে থাকি। এদের মধ্যে কচু, ওল, মূলো, বীট, গাঁজর, শালগম, মিষ্টি আলু বা রাঙা আলু, শাঁক আলু এবং খাম আলুর নাম করা যেতে পারে। মসলা হিসাবে প্রধান খাদ্যের গুণ এবং স্বাদ বাড়াবার জন্যে কয়েকটি ফসল খাদ্যে ব্যবহার হয়ে থাকে। এদের মধ্যে প্রথমেই পেঁয়াজের নাম করতে হয়। তারপর রয়েছে আদা, হলুদ এবং রসুন।

এ সমস্ত মাটির তলার ফসল কি করে চাষ করতে হয় সে বিষয়েই আলোচনা করছি। শুরু করছি আলু চাষের কথা নিয়ে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

মাটির তলার ফসল

আলুর চাষ

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আলু নিত্যকার খাদ্যতালিকায় স্থান লাভ করেছে। আলু একটি মৃদ্‌বর্তী কাণ্ড বা মাটির তলাকার কন্দ। গাছের পাতায় যে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরী হয়, তা গাছের নানা অংশে চালিত হ'বার পর আলুর এই কন্দে জমা হয়। আলুতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য উপাদান থাকায় ইহা আমাদের শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপশক্তি (ইংরেজীতে বলে ক্যালোরী) দান করতে পারে। সম আয়তনের জমিতে অন্য কোন ফসলের চাষ করে আলুর সমপরিমাণ খাদ্যবস্তু পাওয়া সম্ভবপর নয়। একই জমি থেকে যে পরিমাণ ধান বা গম পাওয়া যেতে পারে ভালভাবে চাষ করলে আলু নিশ্চয়ই তার দ্বিগুণ পরিমাণ পাওয়া যাবে। তাই বর্তমান খাদ্যসমস্যার দিনে ভারতবর্ষের মত উন্নতিকারী দেশের পক্ষে উন্নত প্রথায় আলুর চাষ জাতীয় অর্থনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

বেশীর ভাগ জ্ঞানীলোকের ধারণা দক্ষিণ আমেরিকা আলুর আদি জন্মস্থান। সেখানকার চিলি এবং পেরু নামক দু'টি রাজ্যের আন্দিজ পর্বত এলাকায় প্রথমে বুনো আলুর আবির্ভাব ঘটেছিল। আলুর দু'টি প্রজাতি দেখা যায়। যে প্রজাতিটির আবাদ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে তার বৈজ্ঞানিক নাম সোলেনাম টিউবারোসাম। এই প্রজাতিটির আবার অনেক জাতি বা প্রকার রয়েছে।

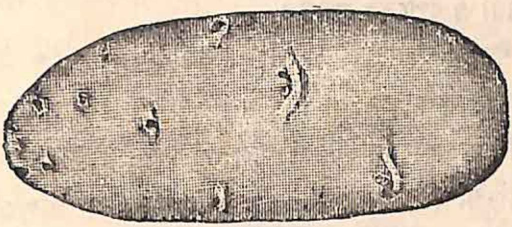
কথিত আছে, ইউরোপের পর্তুগাল নামক দেশের অধিবাসী পর্তুগীজরা সবচেয়ে প্রথমে আমাদের ভারতবর্ষে আলুর আমদানি করে আর প্রায় দু'শো বছর ধরে আমাদের দেশে আলুর চাষ চলছে। খুব ধীরে ধীরে এই চাষের বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে ভারত-

বর্ষে প্রায় আটলক্ষ থেকে দশ লক্ষ একর জমিতে আলুর চাষ হয়। পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়াতেই সবচেয়ে বেশি জমিতে আলুর চাষ হ'য়ে থাকে। সমস্ত পৃথিবীর প্রায় ছয় কোটি একর আলুর জমির মধ্যে রাশিয়াতেই আলুর চাষ হয় প্রায় দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একর জমিতে। এর পর আলু চাষের জমির পরিমাণের দিক দিয়ে জার্মানী (ত্রিশ লক্ষ একর), ফ্রান্স (পঁচিশ লক্ষ একর), দক্ষিণ আমেরিকা (বিশ লক্ষ একর) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (তের লক্ষ একর) নাম করা যেতে পারে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জেও (ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ড একত্রে) আলু একটি প্রধান ফসল। শোনা যায়, একবার আয়র্ল্যাণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকে শুধু আলু খেয়েই বেঁচে ছিল।

ভারতবর্ষে আলু চাষের এলাকা ঃ

আমাদের ভারতবর্ষে উত্তরপ্রদেশে সবচেয়ে বেশী জমিতে আলুর চাষ হয়। তারপর স্থান বিহারের। তবে ইদানীং পাঞ্জাবে আলুর চাষ খুব বেড়ে চলেছে। এই রাজ্যের লুধিয়ানা জেলায় আলুর গড় ফলন ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও আলুর চাষ খুব বিস্তার লাভ করেছে। আলুর মোট জমির পরিমাণের দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই রাজ্যে আলুর চাষ খুব দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ১৯৪৮-৪৯ সনে এখানে মাত্র বিরাশি হাজার ন'শ একর জমিতে আলুর চাষ হ'য়েছিল ; ১৯৫৪-৫৫ সনে আলুর জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১,১১,৭০০ একর (এক লক্ষ এগার হাজার সাতশ' একর)। গত বছর ১৯৭৪-৭৫ সনে এই জমির পরিমাণ বেড়ে হ'য়েছিল প্রায় দু'লক্ষ আট হাজার একর। ১৯৪৮-৪৯ সনে আলুর মোট ফলন হ'য়েছিল প্রায় ২৫ লক্ষ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন (আটষট্টি লক্ষ মণ)। আর ১৯৭৪-৭৫ সনে এর ফলন পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার মেট্রিক টন (সাড়ে তিন কোটি মণ)।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ সমতল অঞ্চলেই আলুর চাষ করা হয়। মোট ত্ব'লক্ষ একর আলুর জমির মধ্যে মাত্র ছ'হাজার একরের মত রয়েছে দার্জিলিঙ জেলার পাহাড়ে এলাকায়। এ অঞ্চলে বছরে তু'বার আলুর ফসল পাওয়া যায়—একবার গ্রীষ্মে, আবার শীতকালে। এখানকার গ্রীষ্মের আলু চাষই প্রধান; কারণ, সে সময়ে যে ফসল



আলু

জন্মায় তা সমতলভূমিতে বীজরূপে ব্যবহার করা হয়। সমতলভূমিতে শুধু শীতকালেই আলুর চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার মধ্যে আলুর চাষ সবচেয়ে বেশী হয় হুগলী জেলায়। তারপর বর্ধমান, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার নাম করা যেতে পারে।

আলু চাষের পক্ষে উপযোগী মাটি, আবহাওয়া আর বীজ বোনার সময়ের কথা প্রথমেই লিখে নিচ্ছি।

মাটি :

আলুর কন্দের আকার প্রধানতঃ মাটির উর্বরতা শক্তির উপর নির্ভর করে। জলা জমি ছাড়া আর সব রকম জমিতেই আর এঁটেল মাটি ছাড়া সব মাটিতেই আলুর চাষ হ'তে পারে। কিন্তু উর্বর, বেলে-দোঁয়াশ মাটিই আলুর পক্ষে সবচেয়ে বেশী উপযোগী।

আলু সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ অম্ল মাটিতে ভাল হয়। যে মাটির অম্লতা ক্ষারত্বের পরিমাপ বা পি. এইচ. ৫.৫ হইতে ৬.০ এর মধ্যে তাতে আলু সবচেয়ে ভাল জন্মায়। পি. এইচ. ৫.০ এর নীচে হ'লে জৈবপদার্থ থেকে গাছের খাবার উপযোগী অজৈব খাদ্য উপাদানগুলি বেরিয়ে আসতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত ছোট ছোট কীটাণুরা

জৈব পদার্থকে অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে ওরা অধিক অম্লত্বে কাজ করবার ক্ষমতা হারায়। তাই অত্যধিক অম্ল জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য উপাদানের অভাবে আলুর বৃদ্ধি ভাল হয় না। আবার জমির পি. এইচ. ৬·৫ এর বেশি হলে আলুর দেদো রোগ হ'বার সম্ভাবনা থাকে।

আবহাওয়া ও বপনের সময় ঃ

আলু শীতের ফসল। যেখানে শীত বেশ বেশি সময় থাকে সেখানেই আলুর ফলন হয় ভাল। আলুর কন্দ গঠনের জন্য ৭০° ডিগ্রী থেকে ৭২° ডিগ্রী ফারেনহিট তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। তাপ-মাত্রা ৮০° ডিগ্রী ফারেনহিটের বেশি হ'লে মোটেই আলুর কন্দ গঠিত হয় না। সেজন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে গ্রীষ্মকালে আলুর চাষ করলে আলু গাছ বেশ সতেজ এবং বড় হয়, কিন্তু তাতে মোটেই আলু ধরে না। বেশি উঁচু পাহাড়ে এলাকার আলুর প্রধান ফসল ফাল্গুন-চৈত্র থেকে চৈত্র-বৈশাখ মাস পর্যন্ত বোনা হয়, কিন্তু নীচেকার পাহাড়ে আরও দু'মাস আগেই অর্থাৎ পৌষ মাসে আলু বোনার কাজ শেষ করা হয়। সমতলভূমিতে প্রধান ফসল ভাদ্র-আশ্বিন থেকে আশ্বিন-কার্ত্তিকে বোনা হয়। সমতল এলাকায় বেশি উঁচু জমিতে অনেক সময়ে আলুর দু'টি ফসল পরপর নেওয়া হয়। প্রথম ফসল বোনা হয় ভাদ্রের গোড়া থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। সেই ফসল খুব তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে সেই জমিতেই অঘ্রাণ মাসের শেষ দিকে দ্বিতীয় আলুর ফসল হিসাবে নাবি জাতের আলুর বীজ বোনা হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে মাদ্রাজ অঞ্চলে বর্ষার পরই আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় বলে সেখানে বর্ষাকালেও একটা আলুর ফসলের চাষ করা হয়। সেখানে আলুর বীজ বোনা হয় আষাঢ় মাসে।

আলুর চাষে আর একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হ'বে। কন্দ গঠনের সময় থেকে ফসল তোলার আগে পর্যন্ত জমিতে বেশ পরিমাণ রস থাকাও একান্ত আবশ্যক।

আলু চাষের উন্নত প্রথা :

আমাদের দেশে বর্তমানে আলুচাষ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াবার প্রয়োজন আছে। কারণ, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য কেবল ধান আর গমের উপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েরা ভাত আর রুটী কিছুটা কম খেয়ে বেশি করে আলু খেলে শরীরও ভাল থাকবে, আর আর্থিক দিক দিয়েও সাশ্রয় হ'বে। বাড়ীর আশেপাশের ছোট একটু টুকরো জমিতেও একটু যত্ন নিয়ে চাষ করলে নিজেদের পরিবারের আলুর চাহিদা অনেকটা মেটানো সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের আলুর গড় ফলন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। তাই এখানে উন্নত প্রথায় চাষ করে আলুরফলন বাড়াবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেখানে প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ৮৫০ জন লোকের বাস এবং এই লোকসংখ্যা প্রতিবছরই দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে সেখানে উন্নত নিয়মে আলুর চাষ করে একর প্রতি ফলন বাড়ানো একান্ত অবশ্যক। আলুর ভাল ফলন পেতে হ'লে নীচের বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হ'বে :

(১) বীজ নির্বাচন।
(২) জমি তৈরী এবং জমিতে আলু বসাবার প্রণালী।
(৩) উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ।
(৪) জমির পরিচর্যা।
(৫) জলসেচ ও জল নিকাশ।
(৬) রোগ ও কীটশত্রুর দমন।

(১) বীজ নির্বাচন : বীজ আলু নির্বাচনের সময়ে প্রথমেই বুঝতে হ'বে ভাল বীজ কাকে বলে। যে জাতের আলুর ভাল ফলন দেবার ক্ষমতা রয়েছে, যাতে অন্য কোনও জাতের মিশ্রণ নেই, যা রোগ জীবাণুমুক্ত এবং যার বাইরের চেহারা সমান ও মসৃণ তাকেই এক কথায় ভাল বীজ আলু বলা যায়। বীজ আলুর ভালমন্দ

শুধু তার ভেতরের গুণাগুণের উপরই নির্ভর করে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। যে সমস্ত চাষী নিদর্শিত আলুর বীজ তৈরী করতে চান তাদের আদর্শ বীজ আলুর উপরে লেখা চারটি অত্যাবশ্যক গুণের সব কটির উপরই বিশেষ নজর রেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হ'বে।

বৈজ্ঞানিকের ভাষায় যাকে বীজ বলা হয় অর্থাৎ যার উৎপত্তি ফলের ভেতর থেকে সেই সত্যিকারের বীজ থেকে কিন্তু আলুর চাষ করা হয় না। আলুর চাষ করতে হ'লে প্রয়োজন এক একটি গোটা আলুর কন্দ। এই রূপান্তরিত মাটির নীচেকার কাণ্ড থেকেই নতুন আলু গাছের জন্ম হয়।

অন্যান্য শস্যের মত আলুর ফলন বৃদ্ধিও বীজের ভালমন্দের উপর খুব বেশি নির্ভর করে। চাষের অন্যান্য নিয়মগুলি ঠিকভাবে মেনে চললে নিশ্চয়ই উন্নত জাতের নীরোগ বীজ আলু থেকে চাষ করা আলু অনেক বেশি ফলন দেয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মণ বীজ আলুর দরকার হয় তার ভেতর দার্জিলিং জেলার পাহাড়ে এলাকা আর ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ মণের মত আলুর বীজ আমদানি করা হয়। অন্যান্য দেশের মধ্যে ব্রহ্মদেশ থেকে কিছু বীজ আলু আনা হয়। এ ছাড়া বাকি বীজ আলু চাষীরা নিজেদের চাষ থেকে সংরক্ষণ করে রাখেন। কিন্তু চাষীরা সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক উৎপাদন এবং সংরক্ষণ করেন না বলে সেই আলু সহজেই রোগগ্রস্ত হয়। এ রকম উপায়ে রোগগ্রস্ত আলু বীজরূপে ব্যবহার করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না।

যে বীজ আলু বাজারে আমদানি করা হ'য়ে থাকে তাও নিদর্শিত করবার কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে এই বীজ আলু বেশ কিছু পরিমাণের মধ্যেও রোগ জীবাণু লুকিয়ে থাকে। নীরোগ বীজ আলু উৎপাদনের জন্য দার্জিলিঙ জেলার রউবুল নামক জায়গায় সমুদ্র সমতল থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে দেড়শত একর জমি নিয়ে একটি

কৃষিক্ষেত্র সরকার স্থাপন করেছেন। সেখানে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বীজ আলু ভাইরাস রোগমুক্ত করা হ'চ্ছে আর সেই সাথে ছত্রাক রোগও দমন করা হ'চ্ছে। দার্জিলিঙ-এর নীরোগ বীজ আলু সেখানকার সরকারী কৃষিক্ষেত্র থেকে সমতলভূমিতে এনে সরকারী পরিচালনায় বাছাই করা চাষীদের মাঠে উন্নত প্রণালীতে চাষ করবার ব্যবস্থা চালু আছে। সেই ফসল থেকে সংগ্রহ করা আলু বীজ আলু হিসাবে ব্যবহারের জন্য সরকারী হিম গুদামে রাখা হয়। এভাবে রোগমুক্ত উন্নত জাতের বীজ আলু পরের বছরে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু এরূপ উন্নত বীজ আলুর পরিমাণও চাহিদার তুলনায় খুবই কম।

আলুর বীজ নির্বাচনের পর সেই বীজ কিভাবে জমিতে বপন করতে হ'বে সেটা বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। মাঝারি আকারের তিন থেকে চার সেন্টিমিটার (এক থেকে দেড় ইঞ্চি) ব্যাসের গোটা আলু বীজ হিসাবে ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল। মাটিতে বসাবার আগে আলু ভাল ক'রে অঙ্কুরিত করে নেওয়া একান্ত আবশ্যক। ভাল রকম অঙ্কুর এসেছে এমন বীজ আলুই শুধু যদি লাগানো যায় তাহ'লে অনেক রোগগ্রস্ত আলু এবং যে আলু থেকে আদৌ অঙ্কুর বেরোবার নয় তা আগেই বাদ পড়ে যাবে। পরে গাছের ফাঁক পূরণ করবার খরচ এবং পরিশ্রম এতে অনেকটা বেঁচে যাবে। তা ছাড়া ভালভাবে অঙ্কুরিত বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় তা সতেজ আর জোরালো হয়। ফলে সেই ফসলের ফলনও বেশি হয়।

অনেক সময়ে অনভিজ্ঞ চাষী হিম গুদাম থেকে আলুর বীজ এনে প্রায় সাথে সাথেই জমিতে বুনতে আরম্ভ করেন। এ রকম অবস্থায় ভাল বীজ থেকেও ভাল ফলন পাবার আশা কম। আলু জমিতে বুনবার দশ পনর দিন আগেই বীজ আলু হিম গুদাম থেকে বের করে নিয়ে আসা খুবই দরকার। বীজ আলু বস্তা থেকে বের ক'রে মেঝেতে বিছানো খড়ের উপর ভালভাবে ছড়িয়ে রেখে আবার উপরে

খড় চাপা দিয়ে দিন সাতেক রেখে দিলেই বেশ ভাল অঙ্কুর বেরিয়ে আসে। কোনও কারণে সময় মত আলুর বীজ হিম গুদাম থেকে বের ক'রে আনা সম্ভবপর না হ'লে "থায়ো ইউরিয়া" নামক ওষুধ ব্যবহার করে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বের করা যায়। এক টিন জলে চার গ্রাম পরিমাণ "থায়ো ইউরিয়া" গুলে তাতে বীজ আলু ৪৫ মিনিট ধরে ডুবিয়ে নিয়ে পরে ছড়িয়ে রেখে দিলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর গজাবে।

আলুর বীজ নির্বাচনের সময়ে আর একটা কথা খুব ভাল করে মনে রাখতে হ'বে। মাঠ থেকে আলু তোলবার পর সাধারণতঃ আড়াই থেকে তিন মাস পর্যন্ত 'সুপ্ত' বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ সে সময়ে অঙ্কুর বেরোয় না। তাই বাইরে থেকে বীজ আলু আমদানি করবার সময়ে এ বিষয়ে খুব সাবধানে থাকতে হ'বে। পাহাড়ে এলাকায় অনেক সময় ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত আলু তোলা হয়। সেই আলু সমতল ভূমিতে এনে জমিতে কার্তিক মাসেই লাগালে অসুবিধায় পড়তে হ'বে। কোন কোন জাতের আলুর আবার ছ' সাত মাস পর্যন্ত নিদ্রিত অবস্থা থাকে।

অঙ্কুরিত গোটা আলু বীজ আলু হিসেবে ব্যবহার করলে আলুর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনও কখনও বীজ আলু খুব বড় আকারের থাকে। তাই সেক্ষেত্রে গোটা আলু বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে বীজের পরিমাণ অনেক বেশি লাগবে। এ অবস্থায় বীজ আলু কেটে বসানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বীজ আলু কাটবার সময়ে সব সময়েই ভাল করে অঙ্কুরিত ক'রে নিয়ে এভাবে কাটতে হ'বে যেন, প্রতিটি খণ্ডে দু'টি সতেজ অঙ্কুর বিদ্যমান থাকে। আর প্রতিটি খণ্ড আকারে এক ইঞ্চির ছোট হওয়া উচিত নয়। প্রতি এক কেজি. ভাল পুষ্ট বীজ আলু থেকে ৫০ থেকে ৬০টি টুকরো হ'তে পারে। এ অবস্থায় প্রতি একরে ছয় কুইন্টাল (১৬ মণ) বীজ আলু লাগবে। গোটা আলু বীজ আলু হিসেবে ব্যবহার করলে আর একটু বেশী পরিমাণ অর্থাৎ একরে ৭ থেকে ৮ কুইন্টাল (২০ মণের মত) লাগতে পারে। অবশ্য ছোট

আকারের গোটা বীজ আলু পাওয়া গেলে ছয় কুইন্টালেই চলবে। বীজ আলু কাটবার সময়ে কাটবার অস্ত্রটাকে প্রতিবারেই মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়ে মুছে নেওয়া ভাল। তাতে একটি বীজ আলুর মধ্যে কোনও রোগের জীবাণু থাকলে তা অন্য বীজ আলুকে সংক্রামিত করতে পারবে না। মেথিলেটেড স্পিরিটের সংস্পর্শে এসে রোগ জীবাণু তার তেজ হারিয়ে ফেলে। বীজ আলু কাটবার পর অল্প ভিজে চটের টুকরো দিয়ে ২৪-২৫ ঘণ্টা ঢেকে রাখা ভাল। তাতে কাটা অংশের উপর একটা পাতলা আবরণের সৃষ্টি হয়। এই আবরণ গঠিত হ'বার পর বীজখণ্ড মাটিতে বসালে মাটির মধ্যকার রোগ জীবাণু সহজে তার ভেতর ঢুকতে পারে না। বীজ আলু জমিতে বসানোর ঠিক আগে গোটা বা কাটা আলুগুলিকে রোগনাশক ওষুধ দিয়ে শোধন করে নেওয়া ভাল। এর ফলে মাটির মধ্যকার কোনও রোগ জীবাণু বীজ আলুর মধ্যে ঢুকতে পারে না। বীজ আলু শোধনের উপায় নীচে লেখা হ'ল। একটা মাটির গামলায় ৭০-৮০ লিটার জলের সাথে একশত গ্রাম পারদঘটিত ওষুধ যেমন এরেটান-৬ অথবা টাফাসন-৬ মিশিয়ে নিতে হ'বে। এই মিশ্রণে ১৫০ কেজি. বীজ আলু মাত্র এক মিনিট ডুবিয়েই তুলে নিতে হ'বে। তারপর বীজগুলি ছায়ায় ছড়িয়ে রেখে শুকিয়ে নিতে হ'বে। এক একর জমিতে বসাবার জন্য যে পরিমাণ বীজ আলু লাগবে তা শোধন করতে চারশত গ্রাম পারদঘটিত ওষুধ লাগবে।

বীজ আলু শোধনের আর একটি নিয়মও প্রচলিত আছে। ১৬০ লিটার জলে ৫০০ (পাঁচশত) গ্রাম "ক্যাপটান-৭৫" নামক ওষুধ মিশেয়ে নিতে হ'বে। এই মিশ্রণে ছয় থেকে আট কুইন্টাল বীজ আলু ১৫ মিনিট ধরে ডুবিয়ে রেখে তুলে নিতে হ'বে। তারপর ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে পরে জমিতে বুনতে হ'বে।

(২) জমি তৈরী ও জমিতে আলু বসাবার প্রণালী : জমিতে বীজ আলু লাগাবার অন্ততঃ মাস খানেক আগে জমির আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে আট থেকে দশ বার লাঙ্গল দিয়ে

চাষ করে মাটিকে ঝুরঝুরে ক'রে নিতে হ'বে। তুই একবার চাষ দিয়েই একর পিছু ২০০ মণ গোবর অথবা আবর্জনা পচা সার (কম্পোষ্ট) মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হ'বে। কাঁচা গোবর মাটিতে দেওয়া উচিত নয়। তাতে মাটির মধ্যেকার সঞ্চিত গাছের খাদ্য নাইট্রোজেনের অপচয় ঘটে। আলুর চাষে অজৈব রাসায়নিক সার পরে দিতেই হ'বে ; কিন্তু শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহার ক'রে আলুর চাষ করা উচিত নয়। উপযুক্ত পরিমাণ জৈব সার অর্থাৎ গোবর ইত্যাদি জমি তৈরী করবার সময়ে দিতেই হ'বে। জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকলে মাটি ভুরভুরে হয় ; তার রস ধরে রাখবার ক্ষমতা বাড়ে। এতে চাষের সুবিধা হয়, আর পরে গাছ বড় হ'তে থাকলে তার শেকড় সহজেই মাটিতে ঢুকতে পারে। শেকড়ের শ্বাসকার্যের জন্য যথেষ্ট বাতাসও মাটিতে সঞ্চিত থাকবার সুবিধা হয়। এতে ঠিকভাবে আলুর কন্দ গঠনে এবং স্বাভাবিক আকার বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকলে গাছের উপকারী জীবাণুগুলি বিশেষ কর্মশক্তি লাভ করে। এই জীবাণুগুলি জৈব পদার্থকে ভেঙ্গে গাছের খাদ্যের উপযোগী মৌলিক উপাদানগুলি বের করে দেয় আর গাছ তার শেকড়ের সাহায্যে রাসায়নিক আকারের মৌলিক উপাদানগুলি খাদ্য হিসেবে টেনে নিতে পারে। আবার বৃষ্টিপাতের সময়ে বা জলসেচের সময়ে জৈব পদার্থ গাছের খাদ্য উপাদানগুলিকে ধরে রাখতে মাটিকে সাহায্য করে। তাই দেখা যাচ্ছে, মাটিতে উগযুক্ত পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করলে এক দিকে মাটি বেশি জল ধরে রাখতে পারে, আবার উদ্ভিদ খাদ্য উপাদানগুলিকেও অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। কারণ মাটিতে জৈব পদার্থ কম থাকলে বৃষ্টি বা জলসেচের সময়ে গাছের খাদ্য উপাদানগুলি ধুয়ে নষ্ট হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা। মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকলে গাছের পক্ষে ক্ষতিকর অম্লত্ব অথবা ক্ষারত্বের মাত্রা বাড়তে পারে না।

আলু চাষের আগে মাস তুই সময় পেলে বর্ষার শেষ দিকে জমিতে

কলাই, বরবটী, ধঞ্চে বা শণ বুনে সবুজ সারও করা যেতে পারে। সে অবস্থায় আর গোবর বা আবর্জনা পচা সারের প্রয়োজন হ'বে না।

জমিতে বার বার লাঙ্গল দেবার পর মই দিয়ে জমি সমতল ক'রে নিতে হ'বে। এ সময়েই সেচ আর জল নিকাশের জন্য নালিও তৈরী ক'রে নিতে হ'বে।

আলু জমিতে লাগাবার সময়ে মাটিতে যাতে উপযুক্ত পরিমাণ রস থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে। চাষ দিতে দিতে জমির রস একেবারে শুকিয়ে গেলে একবার অল্প সেচ দিয়ে 'জো' এলে পর আর একবার চাষ দিয়ে মই এর সাহায্যে জমিটাকে সমান করে নিতে হ'বে। আলু লাগাবার সময়ে জমিতে ঠিক পরিমাণ রস না থাকলে বীজ আলু লাগাবার পর বার বার জলের ঝাপটা দেবার প্রয়োজন হয়। এতে আলুর অঙ্কুর মাটির উপর বেরিয়ে আসবার অসুবিধা হয়। তাই এভাবে বার বার জলের ঝাপটা যাতে না দিতে হয় তার ব্যবস্থা আগেই ক'রে নেওয়া ভাল।

আলু সাধারণতঃ তিনপ্রকার নিয়মে লাগানো হ'য়ে থাকে। (১) প্রথমেই ভেলি বেঁধে ভেলির উপর লাগানো, (২) সরু নালিতে লাগানো, (৩) গর্ত ক'রে লাগানো। পাহাড়ের ঢালু জায়গা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জায়গায় নালা কেটে সারিতে আলু বসিয়ে পরে গাছ বড় হ'লে ভেলি বেঁধে দেবার রীতি প্রচলিত। আলুর এক সারি থেকে আর এক সারি ৫০ সেন্টিমিটার থেকে ৬০ সেন্টিমিটার (মোটামুটি দুই ফুট) দূরে রাখাই ভাল। নির্দিষ্ট দূরত্বে ১৫ সেন্টিমিটার (৬ ইঞ্চি) গভীর নালি কেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক সার আলু বসাবার দুই তিন দিন আগে বেশ ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয় যাতে বীজ আলুর গায়ে সার না লাগতে পারে। বীজ আলুর গায়ে রাসায়নিক সার লাগলে তা পচে যেতে পারে। নালিতে মাটির সাথে সার মিশিয়ে ১৫ সেন্টিমিটার গভীর নালি ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার (২ থেকে ৩ ইঞ্চি) গভীর অবস্থায় রেখে দিতে

হ'বে। জমির সমতলের এই ৫ সেন্টিমিটার নীচে বীজ আলু বসিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে সমতলে এনে আরও ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার মাটি দিতে হ'বে। আলু বসাবার পর প্রতিটি আলুর সারি দেখতে হ'বে জমির সমতল থেকে দুই ইঞ্চি উঁচু এক একটি ছোট্ট ভেলি। প্রতি লাইনে ২০ সেন্টিমিটার (৮ ইঞ্চি) দূরে দূরে এক একটি বীজ আলু বসানোই সব চাইতে ভাল। প্রতিটি বীজ আলু নালীর মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে এভাবে রাখতে হ'বে যেন অঙ্কুরগুলি উপর দিকে থাকে। তারপর দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে ক'রে বীজ আলুটা মাটিতে চেপে বসিয়ে দু'ধার থেকে ধীরে ধীরে মাটি টেনে ঢেকে দিতে হ'বে। এভাবে বীজ আলুগুলি একটু চেপে না বসালে জল দেবার সময়ে আলুগুলি লাইন থেকে সরে যেতে পারে।

যখন একই জমিতে পর পর দু'বার আলুর চাষ করা হয় তখন জলদি প্রকারের আলুর জন্য একটু কম দূরত্বে আলু বসানোই ভাল। এক সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব ৪৫ সেন্টিমিটার (দেড় ফুট) আর প্রতি সারিতে এক একটি গাছের দূরত্ব থাকবে ১৫ সেন্টিমিটার (৬ ইঞ্চি)।

(৩) উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ : গাছের ঠিক ঠিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য আঠারটি মৌলিক উপাদান একান্তভাবে প্রয়োজন। এর ভেতর কার্বন বা অঙ্গার নামক উপাদানটি গাছ বাতাস থেকে নেয়। অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন পায় জল থেকে। বাকি পনরটি মৌলিক উপাদান গাছ টেনে নেয় মাটি থেকে তার শেকড়ের সাহায্যে। মাটিতে যে জৈব সার দেওয়া হয় তাতে এই পনরটি মৌলিক উপাদানের সব কটিই থাকে। কিন্তু নাইট্রোজেন, ফসফরাস আর পটাশিয়াম নামক তিনটি মৌলিক উপাদান আলু গাছের অনেক বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। আলু গাছের বৃদ্ধির সময় মাত্র আড়াই থেকে তিন মাস। জৈব পদার্থের মধ্যেকার খাদ্য উপাদানগুলি খুব ধীরে ধীরে গাছের টেনে নেবার অবস্থায় আসে। তাই অল্প সময়ের মধ্যে আলু গাছকে উপরে লেখা

তিনটি মৌলিক উপাদান বেশি পরিমাণে জোগান দেবার জন্য রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। আলু গাছের পক্ষে এই প্রাথমিক অত্যাবশ্যক মৌলিক উপাদান তিনটির প্রয়োজনীয়তা নীচে লেখা হ'চ্ছে।

নাইট্রোজেন :

(১) ইহা গাছের বৃদ্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

(২) গাছ তার পাতার সবুজ অংশ এবং সূর্যালোকের সাহায্যে বাতাস থেকে কার্বন বা অঙ্গার টেনে নিয়ে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরী করে। কিন্তু মাটি থেকে উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন পাতায় সঞ্চালিত না হ'লে সেই শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গাছের মধ্যে মিশে যেতে পারে না।

(৩) উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেনের সরবরাহ থাকলে গাছের বৃদ্ধির সময় বেড়ে যায় অর্থাৎ গাছ বেশি দিন সবুজ অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে। গাছ বেশি দিন ধরে সবুজ থাকলেই বেশি পরিমাণ কার্বন বাতাস থেকে টেনে নিয়ে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরী করতে পারে।

ফসফরাস :

(১) এই উপাদানটিও গাছের কচি অংশের ভালভাবে বেড়ে ওঠার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

(২) ইহা গাছের মূলের বৃদ্ধি এবং কাজেরও সহায়তা করে।

(৩) মাটির মধ্যে যে সমস্ত উপকারী জীবাণু রয়েছে তাদের পুষ্টি এবং কর্মক্ষমতার জন্য এই উপাদানটি একান্ত প্রয়োজন। এই জাতীয় জীবাণুগুলি ফসফরাসঘটিত খাদ্য পেয়ে বেশ সক্রিয় হয় এবং জৈব পদার্থ ভেঙ্গে সমস্ত প্রকার মৌলিক উপাদানগুলি গাছের খাবার উপযুক্ত অবস্থায় এনে দেয়।

(৪) এ ছাড়া, ফসফরাস পাতায় তৈরী শ্বেতসার খাদ্য মূলের দিকে চালিত করতে সাহায্য করে।

পটাশিয়াম ঃ

(১) গাছের কার্বন জাতীয় খাদ্য গ্রহণের জন্য এই উপাদানটি একান্ত প্রয়োজন। গাছ মাটি থেকে উপযুক্ত পরিমাণে পটাশিয়াম জাতীয় খাদ্য না পেলে বাতাস থেকে কার্বন টেনে নিয়ে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরী করতে পারে না।

(২) এই উপাদানটি পাতা থেকে গাছের সমস্ত জায়গায় শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য চালিত করতে সাহায্যে করে।

(৩) পটাশিয়ামের অভাবে গাছের মধ্যে প্রোটিন তৈরী হ'তে পারে না। গাছ মাটি থেকে যে নাইট্রোজেন টেনে নেয় পটাশিয়ামের অভাবে তা রাসায়নিক আকারেই থেকে যায়, গাছের দেহের সাথে মিশে গিয়ে তার বৃদ্ধিসাধন করতে পারে না।

(৪) পটাশিয়াম গাছকে শক্তসমর্থ রাখে। এতে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে, এক একর জমি থেকে একটা ভাল আলুর ফসল ৫০ থেকে ৬০ কেজি. নাইট্রোজেন, ১০ থেকে ১৫ কেজি. ফসফরাস আর প্রায় ৮০ থেকে ১০০ কেজি. পটাশিয়াম জাতীয় খাদ্য টেনে নেয়। তাই তিনটি খাদ্য উপাদান উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সারের মাধ্যমে জমিতে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। জমিতে রাসায়নিক সার দেবার সময়ে মনে রাখতে হ'বে, রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ, ফসফরাসের মাত্র ১০ থেকে ২০ ভাগ আর পটাশিয়াম এর শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ গাছ টেনে নিতে পারে। আবার একথাও মনে রাখতে হ'বে যে, আমাদের দেশের মাটিতে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু পটাশিয়ামের পরিমাণ মোটামুটি ভালই আছে। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে আর জমিতে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ আলুর জমিতে একর প্রতি ৪০ কেজি. নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি. ফসফরাস আর ৪০ কেজি.

পটাশিয়াম প্রয়োগ করাই সব চাইতে লাভজনক। অবশ্য যে জমির উর্বরতা শক্তি কম তাতে প্রত্যেকটি উপাদান একর প্রতি ৬০ কেজি. পর্যন্ত লাগতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণ জৈবসার দেবার পর এই রাসায়সিক সার প্রয়োজন। জমিতে সঠিক কত পরিমাণ রাসায়নিক সার দিতে হ'বে তা ঠিক করবার জন্য জমিতে জৈবসার দেবার আগেই মাটি পরীক্ষা ক'রে নেওয়া ভাল। যে জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম তিনটি উপাদানই মোটামুটি ভাল পরিমাণে রয়েছে তাতে প্রতিটি উপাদান ৪০ কেজি. ক'রে দিলেই চলবে।

৪০ কেজি. নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে ২০০ কেজি. এমোনিয়াম সালফেট সার থেকে। ৪০ কেজি. উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য ফসফরাস পাওয়া যাবে ২৫০ কেজি. সুপার ফসফেট থেকে। ৪০ কেজি. পটাশিয়াম পাওয়া যাবে ৮০ কেজি. মিউরিয়েট অব পটাশ থেকে। সম্প্রতি উদ্ভিদের ফসফরাসঘটিত খাবারের জন্য সুপার ফসফেটের পরিবর্তে সুফলা অথবা ডাইএমোনিয়াম ফসফেট সার ব্যবহার করে সত্যিকারের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এই দু'টি সারেই নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস দু'রকম গাছের খাদ্যই রয়েছে। সুফলা আবার দু'রকম পাওয়া যাচ্ছে। এক নম্বর সুফলাতে (২০ : ২০ : ০) শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ২০ ভাগ ফসফরাস রয়েছে। আবার দু'নম্বর সুফলাতে (১৫ : ১৫ : ১৫) রয়েছে শতকরা ১৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ১৫ ভাগ ফসফরাস এবং ১৫ ভাগ পটাশিয়াম। ডাই-এমোনিয়াম ফসফেটে রয়েছে শতকরা ১৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর ৪৬ ভাগ ফসফরাস। এ ছাড়া "গ্রো মোর" আর এক রকমের সারও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে যাতে রয়েছে শতকরা ২৮ ভাগ ফসফরাস।

দু'রকমের সুফলা, ডাইএমোনিয়াম ফসফেট অথবা "গ্রো মোর" ব্যবহার করলে এক একর আলুর জমিতে কোন সার কত পরিমাণ লাগবে তা আলাদা আলাদা ক'রে দেখানো হ'ল। নীচে লেখা চার রকম মিশ্রণের যে কোনও একটা ব্যবহার করলেই চলবে ঃ

প্রথম মিশ্রণ ঃ

(১) সুফলা (২০ঃ ২০ঃ ০)—২০০ কেজি.

(২) মিউরিয়েট অব পটাশ—৮০ কেজি.

দ্বিতীয় মিশ্রণ ঃ

সুফলা (১৫ ঃ ১৫ ঃ ১৫)—২৬৭ কেজি.

(আর কোনও সার লাগবে না)

তৃতীয় মিশ্রণ ঃ

(১) ডাইএমোনিয়াম ফসফেট ৮৭ কেজি.

(২) ইউরিয়া ৬২ কেজি.

(৩) মিউরিয়েট অব পটাশ ৮০ কেজি.

চতুর্থ মিশ্রণ ঃ

(১) "গ্রো মোর" ১৪৩ কেজি.

(২) মিউরিয়েট অব পটাশ ৮০ কেজি.

এক একর আলুর জমিতে কোন প্রকারের রাসায়নিক সার কত পরিমাণ লাগবে তা দেখানো হ'ল। কিন্তু শুধু পরিমাণ জানলেই চলবে না। কখন সেই সার মাটিতে দিতে হ'বে তাও ভালভাবে জানতে হ'বে। বীজ আলু মাটিতে বসাবার দু'তিন দিন আগে কিছু পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রতি নালায় ছড়িয়ে এমনভাবে মিশিয়ে দিতে হ'বে যেন সার বীজ আলুর গায়ে একটুও না লাগে। রাসায়নিক সার ৫ থেকে ৬ ইঞ্চি গভীরে ছড়িয়ে তার উপর আরও দু' ইঞ্চি মাটি দিয়ে তার উপর আলুর বীজ বসাতে হবে। এ সময়ে নাইট্রোজেনের অর্ধেক ভাগ অর্থাৎ একর প্রতি ২০ কেজি., সমস্ত ফসফরাস এবং পটাশিয়ামঘটিত সার অর্থাৎ প্রতিটি ৪০ কেজি. পরিমাণ দিতে হ'বে। বাকী ২০ কেজি. নাইট্রোজেন-ঘটিত সার শুধু দিতে হ'বে চাপান সার হিসেবে আলু লাগাবার ৩-৪

সপ্তাহ পর যখন আলুর গাছ মাটি থেকে ১২-১৫ সেমি. উঁচু হ'বে। দুই সারির মাঝখানে গাছের লাইনের ৫-৭ সেমি. দূরে এই চাপান সার ছড়িয়ে দিয়ে বীজের সমতলের একটু নীচে ভাল ক'রে মিশিয়ে দিতে হ'বে।

নাইট্রোজেনঘটিত সার জলসেচ দেবার সাথে সাথে কিছু পরিমাণে ধুয়ে নীচে চলে যায়। তাই সবটুকু নাইট্রোজেন বীজ লাগাবার আগে একবারে না দিয়ে পরে চাপান সার হিসেবে অর্ধেক দিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। আবার ফসফরাস এবং পটাশিয়ামঘটিত সার ধীরে ধীরে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে বলে তার সবটাই বীজ আলু লাগাবার সময়ে দেওয়া ভাল। এদিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে আলুর সার হিসেবে ডাই এমোনিয়াম ফসফেট ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভাল। কারণ, সুফলা অথবা "গ্রো মোর" ব্যবহার করলে নাইট্রোজেন এবং ফসফেট দু'টি উপাদানই একসাথে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ অর্ধেক সার চাপান সার হিসেবে দিলে নাইট্রোজেন আর ফসফরাস দু'টি উপাদানই অর্ধেক দেওয়া হ'বে বীজ লাগাবার আগে আর অর্ধেক লাগাবার তিন সপ্তাহ পরে। এ অবস্থায় চাপান সার হিসেবে প্রয়োগ করা সারটুকুর ফসফেট ভাগটুকু আলুর ফসলের বিশেষ কাজে লাগে না। তাছাড়া, ডাই এমোনিয়াম ফসফেট ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের মোট খরচও কম পড়বে।

ডাই এমোনিয়াম ফসফেট ব্যবহার করলে আলুর বীজ লাগাবার সময়ে একর প্রতি ৮৭ কেজি. ডাই এমোনিয়াম ফসফেট, ১২ কেজি. ইউরিয়া আর ৮০ কেজি. মিউরিয়েট অব পটাশ দিতে হ'বে। পরে চাপান সার হিসেবে দিতে হ'বে শুধু ৫০ কেজি. ইউরিয়া।

১নং সুফলা (২০ : ২০ : ০) ব্যবহার করলে বীজ লাগাবার সময়ে দিতে হ'বে একর প্রতি ১০০ কেজি. সুফলা আর ৮০ কেজি. মিউরিয়েট অব পটাশ। পরে চাপান সার হিসেবে দিতে হবে শুধু ১০০ কেজি. সুফলা।

"গ্রো মোর" ব্যবহার করলে বীজ লাগাবার সময়ে দিতে হ'বে

একর প্রতি ৭৩ কেজি. "গ্রো মোর" আর ৮০ কেজি. মিউরিয়েট অব পটাশ। আর পরে চাপান সার হিসেবে দিতে হ'বে বাকী ৭০ কেজি. "গ্রো মোর"।

সম্প্রতি বর্ধমান সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, কিছু পরিমাণ রাসায়নিক সার মাটিতে দিয়ে আর সামান্য কিছু জলের সাথে মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে গাছের পাতায় ছিটিয়ে দিলে শতকরা ৪০ ভাগ সার বাঁচানো যেতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি মৌলিক উপাদানের একর প্রতি ৪০ কেজি.-র বদলে ২৪ কেজি.-তেই চলবে। এর ভেতর প্রতিটি উপাদানের ২০ কেজি. দিতে হ'বে মাটিতে বীজ আলু লাগাবার ঠিক আগে আর বাকি ৪ কেজি. গাছে ওষুধ ছিটাবার সময়ে স্প্রেয়ারের সাহায্যে। ডাই এমোনিয়াম ফসফেট, ইউরিয়া আর মিউরিয়েট অব পটাশ এভাবে জলের সাথে মিশিয়ে ছিটিয়ে ব্যবহার করা হ'য়েছে। একবারে সবটুকু সার কিন্তু ছিটোনো চলবে না। তাতে গাছের পাতা জ্বলে যাবে। ছিটোতে হ'বে দু'সপ্তাহ অন্তর তিনবারে। আলুর গাছে সাধারণতঃ তিনবার রোগ ও কীট শত্রু দমনের জন্য ওষুধ ছিটানো হয়। ওষুধের সাথে মিশিয়েই রাসায়নিক সার ছিটানো চলবে। তাতে এজন্য আর বাড়তি মজুরের খরচ পড়বে না। প্রতি ৫ লিটার জলে ৩৯ গ্রাম ডাই এমোনিয়াম ফসফেট, ২৪ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৩৭ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ মেশাতে হ'বে। দেখতে হ'বে প্রতি ১০০ লিটার জলে সার এবং ওষুধ মিলে আড়াই কেজি.-র মত যেন হয়।

২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত। সেখানে মাটিতে বেশি সার দিলে গাছের শেকড় তা টানতে পারে না। তাই ঐ এলাকায় আলুর চাষ করতে গেলে কিছু পরিমাণ সার জলের সাথে মিশিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া ভাল। আবার, মেদিনীপুর জেলার উত্তরভাগে, বাঁকুড়া এবং বর্ধমান জেলার আসানসোল এবং পুরুলিয়াতে মাটিতে লোহার ভাগ বেশী থাকায় ফসফরাসঘটিত সার মাটিতে দিলে গাছ তা টেনে নিতে পারে না। তাই এ সমস্ত

স্থানে ফসফরাসঘটিত সার কিছু পরিমাণে জলে মিশিয়ে পাতায় ছিটিয়ে দেওয়াই ভাল। আর এ সমস্ত স্থানে ফসফরাসের উৎস হিসেবে সুপার ফসফেট ব্যবহার না করে দানাযুক্ত ফসফরাসঘটিত সার যেমন, ডাই এমোনিয়াম ফসফেট অথবা সুফলা অবশ্য ব্যবহার করতে হ'বে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি জেলায় এবং দার্জিলিঙ জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় আলুর চাষ করতে গেলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হ'বে। এই সমস্ত স্থানের মাটিতে অম্লভাব খুবই বেশি। তাই মাটির ভেতরকার উপকারী জীবাণুগুলি সক্রিয় হ'য়ে জৈব পদার্থ থেকে গাছের খাদ্য উপাদানগুলি বের করে দিতে পারে না। তাই এই বেশি মাত্রায় অম্লতা দূর করবার জন্যে আলুর জমিতে দু'তিন বছর পর পর অবশ্য চূর্ণ প্রয়োগ করতে হ'বে। বীজ আলু জমিতে লাগাবার মাস দুই আগে একর প্রতি ৩ কু. ৭৫ কেজি. চুন দিতে হ'বে। চুনা পাথর মাটিতে দিলে একর প্রতি প্রায় ১১ কু. ২৫ কেজি. লাগবে।

জমির পরিচর্যা ঃ

অঙ্কুরিত বীজ আলু মাটিতে বসালে ৩-৪ সপ্তাহ পরে আলুর গাছ মাটি থেকে ১০-১৫ সেমি. উঁচু হয়। এ সময়ে আলুর জমিতে ভাল ক'রে নিড়েন দেবার পর গাছের গোড়ায় মাটি উঁচু করে ভেলি বেঁধে দিতে হয়। ভেলি বাঁধবার ঠিক আগেই চাপান সার দিতে হয়।

প্রথমবার ভেলি বাঁধবার দু' সপ্তাহ পর প্রয়োজন হ'লে আবার নিড়েন দিয়ে ভেলি বেঁধে দিতে হ'বে। বৃষ্টির জলে ভেলির মাটি বসে গেলে কখনও কখনও তৃতীয়বার ভেলি করবারও দরকার হয়।

জলসেচ ও জলনিকাশ ঃ

আলু জমিতে বসাবার সময়ে মাটিতে বেশ রস থাকা দরকার। জমিতে পরিমাণ মত রস থাকলে অঙ্কুরিত বীজ আলুর চারা আট

দশদিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসে। লাগাবার সময়ে মাটিতে রস কম মনে হ'লে লাগাবার তিন চারদিন পর থেকে ৩-৪ দিন অন্তর চার-পাঁচবার জল ছিটিয়ে খুব হাল্‌কা সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

তিন-চার সপ্তাহ পর আলুর গাছে প্রথমবার মাটি দেবার পর সাত থেকে আট দিন অন্তর অন্তর তিনবার সেচ দেওয়া দরকার।

পাঁচ-ছ' সপ্তাহ পর দ্বিতীয়বার মাটি দিয়ে দশ-বারদিন অন্তর আরও তিনবার সেচ দিতে হয়।

আলু লাগাবার দশ সপ্তাহ পর পনরদিন অন্তর আরও তু'বার সেচ দেওয়া ভাল।

সাধারণতঃ আলুর জমিতে ছিটানো জল ছাড়া অন্ততঃ আটবার তুই ভেলির মাঝখানে নালায় জল দেওয়া প্রয়োজন। তবে কখন সেচ দিতে হ'বে তা নির্ভর করবে মাটিতে রসের পরিমাণের উপর। মাটিতে যথেষ্ট রস থাকলে তু'-একদিন দেরি ক'রে জল দিতে হ'বে। আবার তাড়াতাড়ি মাটি শুকিয়ে গেলে আরও ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। জমিতে বালির ভাগ বেশি থাকলে অনেক সময়ে দশ-বার বারও জলসেচ দিতে হয়। আবার উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলায় জলসেচ ছাড়াই আলুর চাষ সম্ভব। কারণ, সেখানে সামান্য মাটি খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য সব জায়গায় পরিমাণ মত জলসেচের উপরই আলুর ফলন বিশেষভাবে নির্ভর করে। প্রতিবার নিড়েন দেওয়া এবং ভেলি বাঁধবার পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে। জলসেচের সময়ে লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ভেলির মাথা সেচের জলে ডুবে না যায়, ৫-৭ সেমি. যেন জলের উপর জেগে থাকে।

শুধু জলসেচ নয়, আলুর জমিতে জলনিকাশের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হ'বে। আলুর জমিতে জল দাঁড়ালে মাটির ভিতরকার বাতাস সরে যায় এবং গাছের শেকড়ের শ্বাসকার্যের অসুবিধা হয়; ফলে গাছের জোর কমে যায় আর কন্দ গঠনও ঠিকভাবে হয় না।

পাহাড়ে অঞ্চলে আলুর চাষ করলে মাটির ক্ষয় বন্ধ করবার

ব্যবস্থাও নিতে হ'বে। সেখানে জমির ঢালে কতকগুলি খাত তৈরী করে আলুর চাষ করা হয়।

রোগ ও কীটশত্রুর দমন ঃ

আলু চাষের অন্য সমস্ত উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও রোগ এবং পোকার আক্রমণে গাছের বিশেষ ক্ষতি হ'তে পারে। তাই অন্য সমস্ত উন্নত প্রথার সাথে সাথে রোগ ও কীটশত্রু দমনের জন্য ঠিক ঠিক ব্যবস্থা নিতে হ'বে।

আলুগাছে ছত্রাক, জীবাণু এবং ভাইরাস থেকে নানারকম রোগ জন্মাতে দেখা যায়। তার মধ্যে ভাইরাস ঘটিত রোগই প্রধান। এদের মধ্যে পাতা পাকানো, নক্‌শা বা কুটে লাগা এবং পাতা কুঁচকানো রোগ আলুর বেশি ক্ষতি করে ঃ

পাতা পাকানো রোগ ঃ আলুর সবরকম রোগের মধ্যে এই রোগই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। এ রোগের আক্রমণ হ'লে আলুর ফলন শতকরা ৪০ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়। অনেক সময়ে একটি আলুও হয় না। এই রোগের আক্রমণ হ'লে আলুর পাতার ডগার দিকটা এবং দুই ধার উপর মুখে মাঝখানের শিরার দিকে গুটিয়ে যায়।

নক্‌শা রোগ ঃ এ রোগের আক্রমণ হ'লে পাতার উপর হ'লদে রঙের ছোপ ছোপ দাগ ফুটে উঠে। শতকরা ৩০ থেকে ৮০ ভাগ পর্যন্ত আলুর গাছে এ রোগের আক্রমণ হ'লেও এর জন্যে ফলন খুব বেশি কমে যায় না। এক রকম জাব পোকা এই রোগ এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায়।

পাতা কুঁচকানো রোগ ঃ এ রোগের আক্রমণ মাঝে মাঝে বেশ বেশি দেখা যায়। এ রোগে পাতা পরিষ্কারভাবে কুঁচকে যায়। তাই গাছের বাড়ও কমে যায়। গাছের তেজ কমে যাওয়ায় ফলনও কমে যায়।

ভাইরাস রোগ দমনের উপায় ঃ সুস্থ, পরিপুষ্ট, নীরোগ বীজ

আলু ব্যবহার ক'রেই ভাইরাস রোগ এড়ানো যায়। যে গাছে এ রোগ হ'য়েছে তার আলু বীজ আলু হিসেবে ব্যবহার করলেই গাছে এ রোগ অবশ্যই দেখা দেবে। আলুর গাছে এ রোগ দেখা দেবার সাথে সাথে সেই গাছ তুলে নষ্ট করে ফেললে এ রোগ ছড়াতে পারবে না।

ছত্রাক ঘটিত রোগ :

আলুর নানারকম ছত্রাকঘটিত রোগের মধ্যে ধ্বসা রোগই প্রধান। দু' জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণে আলুর দু'রকম ধ্বসা রোগ হ'য়ে থাকে। একটি আলুগাছের প্রথম অবস্থায়, আর একটি কিছুদিন পরে মাঠে দেখা দেয় বলে এ দু'টোর নাম হ'য়েছে জলদি ও নাবি ধ্বসা রোগ।

জলদি ধ্বসা : এ রোগের আক্রমণ হ'লে আলুগাছের পাতার উপর গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের দাগ পড়ে। রোগের আক্রমণ বেশি হ'লে ক্রমে ক্রমে পাতা পচে যায়, কখনও কখনও শুধু ক্ষতস্থানটি শুকিয়ে পড়ে যায় আর সেখানে একটা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। আলুর ফসল তোলবার সময়ে এ রোগে আক্রান্ত গাছের আলু বাইরে থেকে নীরোগ মনে হ'লেও পরে গুদামে পচে যেতে দেখা যায়।

নাবি ধ্বসা : এ রোগের আক্রমণ হ'লে পাতার ধারে ধারে বাদামী রঙ-এর দাগ ধরে এবং এই দাগ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের প্রকোপ বেশি হ'লে সেই গাছের পাতা পচে যায় এবং খসে পড়ে। আবহাওয়া একটু গরম হ'লে এবং বাতাসে জলের ভাগ বেশি হ'লে এ রোগ খুব ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমতঃ পাতা পচে যাবার জন্যে গাছের খাবার তৈরী হ'তে পারে না ; সেজন্য আলুর আকার খুব ছোট হয় আর ফলনও কম হয়। তাছাড়া, যে পাতায় আক্রমণ হ'য়েছে তা থেকে জীবাণু বৃষ্টির জলে বা শিশিরে ধুয়ে মাটিতে পড়ে এবং আলু যদি মাটি দিয়ে ভালভাবে ঢাকা না থাকে তবে সেই জীবাণু আলুকেই আক্রমণ করে। জীবাণুযুক্ত আলু সহজেই নরম

হ'য়ে পচে যায়। এ রকম আলু যখন গুদামে পচতে আরম্ভ করে তখন তার গায়ে লেগে অন্য আলুও পচতে থাকে। তাতে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি হয়।

ধসা রোগের প্রতিকার ঃ

প্রথমতঃ প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যতদূর সম্ভব রোগমুক্ত বীজ আলু ব্যবহার করা উচিত। পাহাড়ে এলাকা থেকে যে সমস্ত বীজ আলু ভাল করে পরীক্ষা না ক'রে আনা হয় তা থেকেই সমতল-ভূমিতে এ রোগের সূত্রপাত হয়। তাই পাহাড়ে এলাকা থেকে শীত পড়বার বেশ কিছুদিন আগেই বীজ আলু সমতলভূমিতে আনা উচিত। তাহ'লে বীজ লাগাবার আগে বেশ কিছুদিন সময় বেশি তাপে থেকে বীজ আলুর মধ্যেকার জীবাণু কিছু পরিমাণে নষ্ট হ'তে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আলু ভালভাবে মাটিচাপা দেওয়া উচিত ; তাহ'লে পাতায় লাগা জীবাণু থেকে মাটির নীচেকার আলুর আক্রমণ হ'বার সম্ভাবনা কমে যায়।

আলু জমি থেকে তোলবার পর গাছের পাতা এবং ডাঁটা কুড়িয়ে নিয়ে সে সব পুড়িয়ে ফেলা উচিত। কারণ, এ সবের সাথে রোগের জীবাণু মাটিতে থেকে যেতে পারে।

রোগ দমনের সবচেয়ে ফলদায়ক নিয়ম হ'চ্ছে ওষুধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। এতে কিছু খরচ হ'লেও বিপুল ক্ষতি থেকে নিশ্চিত রক্ষা পাওয়ায় যে লাভ হয়, তাতে সেই ব্যয় পুষিয়েও বাড়তি লাভ থাকে। তাই রোগের আক্রমণ হোক বা না হোক নিয়মিতভাবে ওষুধ প্রয়োগ করা খুবই উচিত। আলু জমিতে বসাবার পনেরো-বিশদিন পর একর প্রতি এক কেজি. তামাঘটিত ওষুধ যেমন, ব্লাইটক্স অথবা ফাইটোলান, অথবা আধকেজি. দস্তাঘটিত ওষুধ যেমন, হেক্সাথেন বা জিনেব বা ডাইথেন-জেড দুইশত লিটার জলে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। ওষুধ এমনভাবে ছিটাতে হ'বে যেন সমস্ত পাতার উপর এবং নীচের দিকে সমানভাবে পড়ে।

প্রথমবার ওষুধ প্রয়োগের ছ'সপ্তাহ পর সমান পরিমাণ ওষুধ দুইশত লিটার জলে মিশিয়ে আবার ছিটানো প্রয়োজন।

আলু বসাবার ছয় থেকে আট সপ্তাহ পর তৃতীয়বার ওষুধ ছিটানো আবশ্যক। এ সময়ে চারশত লিটার জলে দুই কেজি. তামাঘটিত অথবা এক কেজি. দস্তাঘটিত ওষুধ মেশানো প্রয়োজন।

ভাইরাস এবং ধসা ছাড়া আরও কয়েক রকম ছত্রাকঘটিত এবং ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণুঘটিত রোগও আলুর ক্ষেতে কমবেশি দেখা যায়। কিন্তু এসব রোগে বিশেষ ক্ষতি হয় না। এসব রোগের প্রতিকারের একমাত্র উপায় রোগমুক্ত বীজ আলু ব্যবহার করা। জীবাণুঘটিত অথবা ছত্রাকঘটিত কোন কোন রোগের আক্রমণে আলুগাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে। সুস্থ, সতেজ গাছ হঠাৎ ঢলে পড়লে বুঝতে হ'বে জীবাণুঘটিত রোগ হ'য়েছে। এ রোগ দেখা দিলে একর প্রতি দেড় কেজি. ক্যাপটান-৮৩ নামক ওষুধ চারশত পঞ্চাশ লিটার জলে মিশিয়ে সুস্থ গাছে ছিটিয়ে দিলে আক্রমণ কম হ'তে পারে।

আবার যদি দেখা যায়, গাছের গোড়া থেকে উপরের দিকে একটু একটু ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছে এবং ঠিক মাটির উপরে গাছের কাণ্ডে খুব ছোট ছোট আলুর মত জন্মেছে, এ রোগ এক রকম ছত্রাক থেকে জন্মেছে। এ রোগের আক্রমণ খুব বেশি হ'লে বুঝতে হ'বে জমিতে অম্লের ভাগ খুব বেড়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় জমিতে চুন প্রয়োগ করা একান্ত আব্যশ্যক।

কীটশত্রু ঃ

নানারকম রোগ ছাড়া আলুর ক্ষেতে অনেক পোকার আক্রমণও দেখা যায়। এ সমস্ত পোকার মধ্যে কাটুই পোকা, ঘুরঘুরে পোকা, জাব পোকা এবং কাঁঠালে পোকা আলুর বেশি ক্ষতি করে। সুতলি পোকা নামে এক রকমের পোকা গুদামে আলু খেয়ে নষ্ট করে।

কাটুই পোকা ঃ এরা প্রজাপতি জাতীয় এক রকম পোকার

হাল্কা সবুজ রঙের শূককীট। এরা মাটির তলায় থাকে; রাত্রিবেলা মাটির উপরে এসে গাছের কাণ্ডের গোড়া কেটে ফেলে।

ঘুরঘুরে পোকা ঃ এই পোকা মাটির নীচে থেকে আলুগাছের মূল এবং পরে আলুগুলিকেই খেতে আরম্ভ করে। এরা এক থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা ধূসর রঙের এক রকম পোকা; ছোট শক্ত পাগুলো দিয়ে মাটি খুঁড়ে উপরে উঠতে পারে।

দমন ঃ কাটুই পোকা এবং ঘুরঘুরে পোকার আক্রমণ দমন করবার জন্য অলড্রিন, ক্লোরড্রিন অথবা হেপ্টাক্লোর নামক গুঁড়ো ওষুধ ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। একর প্রতি পনেরো কেজি. গুঁড়ো ওষুধ শেষ চাষ দেবার সময়ে জমিতে ভাল ক'রে মিশিয়ে দিতে হয়। আলুর বীজ জমিতে বসাবার ঠিক আগে নালাতে রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়েও এই ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জাব পোকা ঃ এরা আলুর পাতার রস খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। এ পোকা ভাইরাস জাতীয় কুটে রোগের বাহক। রোগগ্রস্ত পাতার রস খাবার পর সুস্থ গাছের পাতায় বসে এরা রোগ ছড়ায়।

কাঁঠালে পোকা ঃ এরা আলুর পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এতে পাতায় জালের মত অনেক ছিদ্র হ'য়ে পড়ে। এ জাতীয় পোকার আক্রমণ বেশি হ'লে গাছের পাতা শুকিয়ে যায় এবং তার ফলে গাছ মরে যায়।

দমন ঃ জাব পোকা আর কাঁঠালে পোকার আক্রমণ দূর করবার জন্য প্রতি চারশত লিটার জলে এক কেজি. জলে গোলা ডি. ডি. টি. মিশিয়ে ছিটাতে হ'বে। ছত্রাকনাশক ওষুধের সাথে মিশিয়েই একত্রে এই ওষুধ আলুর মাঠে স্প্রেয়ারের সাহায্যে ছিটাতে হয়। এই ওষুধের ব্যবহারে কাটুই পোকার আক্রমণও কিছু পরিমাণে নিবারণ করা যায়।

শস্য পর্যায় ঃ

ঠিক মত শস্য পর্যায় অবলম্বন ক'রেও অনেক সময়ে আলুর

রোগের আক্রমণ কমানো যায়। সাধারণতঃ আলুচাষের আগে খরিফ-খন্দে পশ্চিমবঙ্গে আউশধান বা পাট লাগানো হয়। দুই বছরের শস্য পর্যায়ে নীচের লেখা ফসলগুলি লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

	খরিফ	রবি
প্রথম বৎসর—	পাট	আলু
দ্বিতীয় বৎসর—	আউশধান	ডাল জাতীয় ফসল

বছরের পর বছর একই জমিতে আলু লাগালে রোগের জীবাণু মাঠে থেকে যায়। আবার পাট এবং আলু দু'টি ফসলেই একই প্রকার ছত্রাক রোগ 'গোড়াপচা' রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এ অবস্থায় ঐ জমিতে পাটের চাষ দুই এক বছর বন্ধ রাখা ভাল। কারণ পাটে এই রোগ হ'লে সেই রোগ পরের ফসল আলুতেও সংক্রামিত হ'তে পারে।

মিশ্রশস্য হিসেবে আলুর ক্ষেতে ভুঁই-কুমড়ো, পালংশাক, লঙ্কা প্রভৃতির চাষ বেশ লাভজনক। পাহাড়ে এলাকায় ভুট্টার সাথে মিশ্রিত ফসল হিসেবেও আলুর চাষ করা হয়।

আলু উঠানো ও ফলন ঃ

আলু গাছ পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে বুঝতে হ'বে আলু ঠিকমত পেকেছে। এ সময়ে জমি থেকে আলু উঠিয়ে নিতে হ'বে। আলু ভালমত পাকলে তার খোসা পুরু হয় এবং বেশিদিন গোলাজাত ক'রে রাখা যায়। আলু তোলবার সময়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে আলুগুলি কেটে না যায় বা কোন রকমে নষ্ট না হয়। সাধারণতঃ আলু তিন মাসের ফসল। শীত বেশী দিন থাকলে সাড়ে তিন মাস পর্যন্ত আলু মাঠে রাখা চলে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই মাঠের সমস্ত আলু তুলে ফেলা হয়। কারণ এ সময়েই বেশ গরম পড়ে আর সমস্ত আলুর গাছ শুকিয়ে যায়।

আমাদের পশ্চিবঙ্গে আলুর ফলন খুবই কম। গড় ফলন একর প্রতি ৪৫ কুইন্টাল থেকে ৫৬ কুইন্টাল ২৫ কেজি-র বেশি হয় না।

কিন্তু সব রকম যত্ন নিয়ে উন্নত প্রথায় চাষ করলে এক একর জমিতে আলুর চাষ করে ১১২ কুইণ্টাল ৫০ কেজি. ফলন সহজেই পাওয়া যেতে পারে।

আলুর জাত ঃ

আলুর অনেক রকম জাত বা প্রকার আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কেবল কয়েক জাতের আলুর চাষ হ'য়ে থাকে। প্রত্যেক জাতের পাকবার সময়, ফলন, স্বাদ এবং রোগ ও কীটের আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি প্রভৃতি আলাদা। জলদি, মধ্যম এবং নাবি—এই তিন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতের আলু আছে। শ্রেণী বিভাগ করে ভারতবর্ষে প্রচলিত কয়েকটি আলুর জাতের নাম নীচের তালিকায় দেওয়া হ'লো।

জলদি	মধ্যম	নাবি
গোলা, দার্জিলিঙ লাল গোল, গৌহাটি, টুক্‌রী, কুফরী সিন্দুরী, ফুলুয়া।	রয়্যাল কিডনী, আপটুডেট, কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী চমৎকার, কুফরী কুন্দন, কুফরী কুবের, জ্যোতি।	ম্যাগনাম বোনাম, এগার সিগ্‌ন, কুফরী কিসান, ক্রেগস্ ডিফারেন্স।

রয়্যাল কিডনী, আপটুডেট এবং ম্যাগনাম বোনাম এই তিনটি জাতই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নৈনিতাল আলু নামে পরিচিত এবং এর চাষই এখানে সবচেয়ে বেশি। রয়্যাল কিডনী জাতের আলু ব্রহ্মদেশ থেকে বেশি আমদানী করা হয় বলে এ জাতের আলুকে রেঙ্গুন আলুও বলা হয়। কিছুদিন যাবৎ কুফরী চন্দ্রমুখী জাতের আলুর চাষের দিকেই আমাদের চাষীরা বেশি ঝুঁকেছেন। কারণ, এর ফলন ভাল, খেতেও সুস্বাদু এবং সংরক্ষণ করাও সুবিধাজনক।

আলুর সংরক্ষণ ঃ

আমাদের দেশে পাহাড়ে এলাকায় গরমকালের তাপমাত্রা কিছু কম বলে সেখানে সহজেই আলু সংরক্ষণ ক'রে রাখা যায়। দার্জিলিঙ অঞ্চলে মেঝেতে এক ফুট উঁচু ক'রে আলু রাখা যায়। পনেরো দিন অন্তর একবার আলুগুলি নেড়ে উল্টিয়ে দিলেই চলে। কিন্তু সমতলভূমিতে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা খুব বেশি বলে আলুর সংরক্ষণ একটি বড় সমস্যা। সাধারণতঃ মেঝেতে আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি বালি ছড়িয়ে বা মাচান তৈরী ক'রে তার উপর তিন চার ইঞ্চি পুরু ক'রে আলু রাখা যেতে পারে। পোকার আক্রমণ থেকে আলু রক্ষা করবার জন্য প্রতি ৩ কু. ৭৫ কেজি. আলুতে প্রায় ১৮০ গ্রাম ডি. ডি. টি. বা গ্যামেক্সিন গুঁড়ো মিশিয়ে নিতে হয়। কিন্তু এভাবে আলু রাখলে শততরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ আলু নষ্ট হ'য়ে যায়। তাছাড়া, আরসোলা এবং ইঁদুরও গুদামে রাখা আলুর অনেক ক্ষতি করে। ইঁদুরের উৎপাত বেশি হ'লে ইঁদুর মারবার ওষুধ ব্যবহার করা ভাল। আজকাল বাজারে নানারকম ইঁদুর মারবার ওষুধ বেরিয়েছে। এগুলো হ'চ্ছে র‍্যাটাফিন, রোজেফারিন, রোডেথ ইত্যাদি। কোনও খাবারের সাথে এই ওষুধ মিশিয়ে ইঁদুর যেখানে যাতায়াত করে সেখানে রাখতে হ'বে। প্রতি বিশভাগ খাবারের সাথে এক ভাগ ওষুধ মিশিয়ে দিতে হ'বে। এর সাথে দিতে হ'বে সামান্য একটু সরষের তেল। এই বিষ মেশানো খাবার খেলে ইঁদুর দু' একদিনের মধ্যেই মরে যাবে।

আলু সংরক্ষণ করবার সব চাইতে ভাল উপায় হিমগুদাম বা ঠাণ্ডাঘরে আলু রাখা। ঠাণ্ডাঘরে আলু ৪০° ডিগ্রী ফারেনহিট (৪৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) তাপে রাখা হয়। কিন্তু বীজ আলু রাখতে হ'লে তাপমাত্রা আরও একটু কমিয়ে ৩৫° থেকে ৩৮° ফারেনহিট করলে ভাল হয়। ঠাণ্ডাঘরে আলু রাখলে পোকা বা ছত্রাকের আক্রমণ হ'তে পারে না। এ ভাবে রাখা আলুর শতকরা ১০ ভাগের বেশি নষ্ট হ'তে পারে না।

আলু চাষে আয়ব্যয়ের হিসাব ঃ

এক একর জমিতে উন্নত প্রথায় আলু চাষ করলে কত খরচ হ'তে পারে আর তা থেকে কত আয় হ'তে পারে তার বিস্তারিত হিসাব নীচে দেখানো হ'ল—

প্রথমে বিভিন্ন খাতে কি কি খরচ হ'বে তা দেখানো হ'চ্ছে ঃ (আনুমানিক)।

	টাকা
১। বীজ আলুর দাম (৫ কু. ৬২½ কেজি. প্রতি ৩৭½ কেজি, ৫০ টাকা হিসেবে)	— ৭৫০·০০
২। গোবর বা আবর্জনা সারের দাম (৭৫ কু. প্রতি ৩৭½ কেজি. ২ টাকা হিসেবে)	— ৪০০·০০
৩। রাসায়নিক সারের মূল্য ঃ (ক) ডাই এমোনিয়াম ফসফেট—৮৭ কেজি. (খ) ইউরিয়া —৬২ কেজি. (গ) মিউরিয়েট অব পটাশ —৮০ কেজি.	— ৫০০·০০
৪। ছত্রাক ও কীটনাশক ওষুধের মূল্য ঃ (ক) অলড্রিন—১৫ কেজি. (খ) ব্লাইটক্স—৬ কেজি. (গ) ডি. ডি. টি.—৩ কেজি.	— ৮০·০০
৫। জলসেচ দেবার জন্য জিনিসপত্রের মূল্য ঃ (ক) পাওয়ারিন—১২ গ্যালন (খ) পেট্রল—১ লিটার (গ) মোবিল অয়েল—১ গ্যালন	— ১০০·০০
৬। বিভিন্ন খাতে শ্রমিকের মজুরী (১৫০টি দৈনিক ৬ টাকা হিসেবে)	— ৯০০·০০

শ্রমিকের সংখ্যা

(১)	লাঙ্গল চালানো এবং মই দেওয়া	—	৩০
(২)	আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার	—	৩
(৩)	জৈব সার প্রয়োগ	—	৩
(৪)	আলু লাগাবার জন্য নালী তৈরী করা	—	১২
(৫)	রাসায়নিক সার প্রয়োগ এবং মেশানো	—	৭
(৬)	আলু লাগানো	—	১২
(৭)	প্রথমবার নিড়েন দেওয়াএবং ভেলী বাঁধা	—	১৫
(৮)	দ্বিতীয়বার ভেলী বাঁধা	—	১০
(৯)	তৃতীয়বার ভেলী বাঁধা	—	৮
(১০)	জলসেচ দেওয়া	—	১২
(১১)	ওষুধ ছিটানো	—	৮
(১২)	আলু তোলা এবং গুদামে নেওয়া	—	৩০
			১৫০

মোট খরচ—২,৭৩০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ২,৮০০ টাকা

এক একর আলুর চাষে ২,৮০০ টাকা খরচ করলে ১১২ কু. ৫০ কেজি. আলু পাওয়া যাবে। প্রতি ৩৭½ কেজি.-র দাম কম ক'রে ২০ টাকা করে ধরলেও মোট আয় হ'বে ৬,০০০ টাকা। অর্থাৎ এক একর জমিতে আলুর চাষ ক'রে নীট লাভ (৬,০০০ টা.— ২,৮০০ টা.) ৩,২০০ টাকা (তিন হাজার দু'শ টাকা) পর্যন্ত হ'তে পারে।

মিষ্টি আলু

যে সমস্ত মাটির তলার ফসল আমরা তরকারি হিসেবে খেয়ে থাকি তাদের মধ্যে আয়তনের দিক থেকে ভারতবর্ষে আলুর পরই মিষ্টি আলুর স্থান। পৃথিবীর যে সমস্ত জায়গায় তাপমাত্রা বেশ বেশি সেখানেই প্রধানতঃ মিষ্টি আলুর চাষ হয়। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েৎনাম এবং উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ ভাগেই মিষ্টি আলুর চাষ বেশি হয়। মিষ্টি আলুকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও রাঙা আলুও বলা হয়। কিন্তু সব মিষ্টি আলু রাঙা বা লাল নয়। সাদা মিষ্টি আলুও আছে। মিষ্টি আলুতে প্রচুর শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য রয়েছে। অল্প পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ 'সি'-ও এতে আছে। এই আলু তরকারিতে খাওয়া যায় আবার এ থেকে মদও তৈরি করা হয়। মিষ্টি আলুর পাতাও বেশ পুষ্টিকর। কোনও কোনও স্থানে এই পাতাও সব্জি হিসেবে খাওয়া হয়।

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ এলাকায় মিষ্টি আলুর জন্মস্থান। বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচলক্ষ একর জমিতে মিষ্টি আলুর চাষ করা হয়। সমস্ত রাজ্যেই কমবেশি মিষ্টি আলুর চাষ রয়েছে।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

মিষ্টি আলু চাষের জন্য বেশ লম্বা দিন বা গরম আবহাওয়া প্রয়োজন। বেশি বৃষ্টিপাতে মিষ্টি আলুর ক্ষতি হয়। বেশ কিছু-দিন বৃষ্টি না হ'লেও মিষ্টি আলুর বিশেষ ক্ষতি হয় না। ৭০° ডিগ্রী ফারেনহিট থেকে ৮৫° ডিগ্রী ফারেনহিট তাপই এই ফসলের স্বাভাবিক বাড়ের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি হ'লে মিষ্টি আলুর লতাপাতাই বেশি বাড়ে, কন্দ বেশি বড় হ'তে পারে না।

হাল্‌কা বেলে দোঁয়াশ মাটিতেই মিষ্টি আলু সবচেয়ে ভাল জন্মায়। মাটি বেশ ঝুরঝুরে হওয়া প্রয়োজন যাতে জল জমে না থাকে। কিছুটা অম্লযুক্ত মাটি যার অম্লত্ব ক্ষারত্বের পরিমাণ বা পি. এইচ. ৫·৮ থেকে ৬·৭ এর মধ্যে তাতেই এই ফসল ভাল জন্মায়। পি. এইচ. ৫·২ এর কম হ'লে জমিতে চুন প্রয়োগের প্রয়োজন।

জমি তৈরী ঃ

প্রথমে মিষ্টি আলুর জমিতে পাঁচ-ছয়বার লাঙ্গল দিয়ে মাটিটাকে বেশ ঝুরঝুরে করে নিতে হ'বে যাতে কন্দের গঠন মাটির তলায় ভালভাবে হ'তে পারে। কিন্তু মিষ্টি আলুর জমিতে আলুর মত এত গভীর চাষ দেবার দরকার হয় না। দুই একবার চাষ দিয়েই একর প্রতি ৩৭ কু. ৫০ কেজি. গোবর জমিতে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। এরচেয়ে বেশি গোবর দিলে লতাপাতার বাড়ই বেশি হয়, কন্দ থেকে যায় ছোট।

বীজ নির্বাচন ও বপনের সময় ঃ

সাধারণতঃ পুরানো লতা থেকে বীজতলায় বীচন তৈরী ক'রে সেই বাচন জমিতে লাগিয়ে মিষ্টি আলু চাষ করা হয়। কখনও কখনও বীজতলায় মিষ্টি আলুর কন্দের টুকরো বসিয়ে তার থেকে যে নতুন চারা পাওয়া যায় তা তুলে জমিতে লাগিয়েও মিষ্টি আলুর চাষ করা হয়। তবে এ নিয়মে চাষ আমাদের দেশে খুব কম হয়।

আমাদের দেশে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অথবা বর্ষার শুরুতে আষাঢ় মাসে মিষ্টি আলুর বীচন বসানো হয়। বীজতলায় বীচনগুলি ৪৫ সেন্টিমিটার (১৮ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে বসানো হয়। প্রতি সারিতে বীচনগুলি •৩০ সেন্টিমিটার (১২ ইঞ্চি) দূরে দূরে থাকে। এক একর জমির জন্য ১৫,০০০-এর মত লতার টুকরো প্রয়োজন। এর ওজন হ'বে প্রায় ৪০০ কিলোগ্রাম।

জমিতে লাগাবার নিয়ম :

সাধারণতঃ সমতল জমিতে নালী খুঁড়ে তাতে রাসায়নিক সার মিশিয়ে মিষ্টি আলুর বীচন বসানো হয়। একটি নালী থেকে আর একটি নালী থাকবে ৬০ সেন্টিমিটার (২৪ ইঞ্চি) দূরে। প্রতি নালীতে ৩০ সেন্টিমিটার (১২ ইঞ্চি) দূরে দূরে মিষ্টি আলুর বীচনগুলি বসাতে হ'বে। প্রতিটি লতার টুকরো যা বীচন হিসাবে ব্যবহার করা হ'বে তাতে কমপক্ষে চারটি জোড়া থাকবে। জমিতে বসাবার সময়ে বীচনগুলি খাড়াভাবে থাকবে যাতে ত্ব'টি জোড়া থাকে মাটির নীচে আর ত্ব'টি থাকে উপরে। যেখানে বৃষ্টি বেশি হয় সেখানে ভেলি বেঁধে তার উপর মিষ্টি আলুর বীচন বসানো হয়।

জমিতে মিষ্টি আলুর বীচন লাগাবার সময় ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানা রকম। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণতঃ ভাদ্র মাসের গোড়ার দিকেই বসানো হ'য়ে থাকে।

সার প্রয়োগ :

মিষ্টি আলুর জমিতে জৈব সার ছাড়া আর কোনও নাইট্রোজেন ঘটিত সার দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। একর প্রতি ২০ কেজি. ফসফরাস এবং ২০ কেজি. পটাশিয়ামযুক্ত সার দিলে কন্দ আকারে বড় হয়। এই রাসায়নিকসার জমিতে বীচন লাগাবার আগে নালীতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। ২০ কেজি. ফসফরাস পাওয়া যাবে ১২৫ কেজি. সুপার ফসফেট থেকে আর ২০ কেজি. পটাশিয়াম পাওয়া যাবে ৪০ কেজি. মিউরিয়েট অব পটাশ নামক সার থেকে।

জলসেচ :

মিষ্টি আলুর বীচন জমিতে বসাবার পরই সেচ দিতে হয়। বৃষ্টি না হ'লে প্রথম সেচ দেবার সাত দিন পরেই আবার সেচ দেওয়া প্রয়োজন। শীতের শেষে বা গ্রীষ্মের প্রথমে লাগালে মিষ্টি আলুতে ১২ থেকে ১৪বার জলসেচ প্রয়োজন। ভাদ্র মাসে লাগালে সাধারণতঃ তিন-চারবারের বেশি জলসেচ দেবার দরকার হয় না।

মাদ্রাজে বর্ষাকালে একেবারেই জলসেচ না দিয়ে মিষ্টি আলুর চাষ করা হয়।

পরিচর্যা ঃ

জমিতে মিষ্টি আলুর বীচন লাগাবার পর প্রথম অবস্থায় আগাছা নষ্ট করবার জন্য দু'তিন বার বিদা দেওয়া প্রয়োজন। বীচন জমিতে লাগাবার দশ দিনের মধ্যে চারা মাটিতে লেগে যায় এবং তিন সপ্তাহ পরই লতাপাতার বেশ বাড় হয়। এ সময়েই প্রথম নিড়েন দেওয়া আবশ্যক। বীচন লাগাবার দেড় থেকে দু'মাস পর একবার মাটি দিয়ে উঁচু ভেলি বেঁধে দেওয়া দরকার। বর্ষা বেশি হ'লে এর আগেই ভেলি বেঁধে দিতে হয়। প্রয়োজন হ'লে প্রথমবার ভেলি বাঁধবার তিন সপ্তাহ পর আবার ভেলিতে মাটি দিতে হ'বে।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

মিষ্টি আলুতে রোগের আক্রমণ খুব কমই দেখা যায়। বর্ষা বেশি হ'লে মাঝে মাঝে এক রকম ছত্রাকঘটিত পাতাপচা রোগ দেখা যায়। রোগমুক্ত মাঠ থেকে বীচন যোগাড় করাই এই রোগ প্রতি-কারের প্রধান উপায়।

এক রকমের কাটুই পোকা মিষ্টি আলুর পাতা খেয়ে নষ্ট করে। জলে গোলা ডি. ডি. টি. স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিলে এই রোগের আক্রমণ দমন করা যায়। প্রতি ৪০০ লিটার জলে এক কেজি. ডি. ডি. টি. মেশাতে হ'বে। একর প্রতি ১৫ কেজি. অলড্রিন, ক্লোরড্রিন অথবা হেপ্টাক্লোর নামক গুঁড়ো ওষুধ শেষ চাষ দেবার সময়ে জমিতে ভাল ক'রে মিশিয়ে দিয়েও এই পোকার আক্রমণ নিবারণ করা যায়।

ফসল তোলা ও ফলন ঃ

মিষ্টি আলুর কন্দগুলি ভালভাবে গঠিত হ'লে পাতার রঙ ফিকে হ'তে থাকে এবং ক্রমে পাতাগুলি হলদে হ'য়ে যায়। এ অবস্থায়

মিষ্টি আলু মাঠ থেকে তুলতে হয়। মাঠ থেকে তুলতে চার পাঁচ সপ্তাহ দেরী করলেও মিষ্টি আলুর ফলন কমে যায় না। কিন্তু এর চাইতে বেশি দেরী করলে ফলন কমে যেতে পারে। কোদালের দ্বারাই মাঠ থেকে ফসল তোলা হয়। তুলে রোদে দু'চারদিন শুকিয়ে নিতে হ'বে।

মিষ্টি আলুর ফলন তার জাতের উপরই বেশি নির্ভর করে। গড়ে একর প্রতি ৪০০০ কেজি. ফলন পাওয়া যায়। যত্ন নিয়ে চাষ করলে একর প্রতি ১২০০০ কেজি. ফলন পাওয়া যেতে পারে।

মিষ্টি আলুর জাত ঃ

মিষ্টি আলুর অনেক জাত আছে। তিন রকম রঙ-এর মিষ্টি আলু দেখা যায়। সাদা, সোনালী আর লাল। এই রঙ অনুসারে মিষ্টি আলুর জাত ভাগ করা হয়। উন্নত জাতের মিষ্টি আলুর মধ্যে নীচের কয়েকটির নাম করা যেতে পারে। পুসা সফেড, পুসা লাল, পুসা সুনেরী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যে সমস্ত জাতের চাষ বেশি করা হ'য়ে থাকে তাদের নাম দেওয়া হ'ল।

পশ্চিমবঙ্গ—রাঙ্গের, বি-৪৩০৬

বিহার—এস. পি-৩, এস. পি-৯, এস. পি-লালকা

কর্ণাটক—ভি-১২, হোসুর রেড, হোসুর গ্রীন।

তামিলনাড়ু—ভি-১২, ভি-৬, ভি-৮, ভদ্রকালী এবং ভেলমোন

পাঞ্জাব—ভি-২, ভি-৬, ভি-৮।

বিদেশী জাতের মধ্যে আমেরিকার গেল্ডরাস এবং সেন্টেনিয়েল খুব সুস্বাদু।

সংরক্ষণ ঃ

৬০° ডিগ্রী ফারেনহিট তাপে মিষ্টি আলু সংরক্ষণ করাই সবচেয়ে ভাল। লাল জাতের মিষ্টি আলু বেশিদিন সংরক্ষণ ক'রে রাখা যায়। মাদ্রাজে গর্ত খুঁড়ে তাতে মিষ্টি আলু রেখে খড় দিয়ে মুখটা দু'তিন মাস ঢেকে রাখা হয়। এভাবে রাখলে পোকায় বেশ ক্ষতি করে। আলুর সাথে ডি. ডি. টি.-র গুঁড়ো মিশিয়ে নিলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

মানকচু

মাটির তলার যে সমস্ত ফসল আমরা তরকারী হিসেবে খেয়ে থাকি তাদের মধ্যে আলু এবং মিষ্টি আলুর পরই কচুর নাম করতে হয়। কচু নানারকমের দেখা যায়। তার ভেতর আমাদের দেশে চাষের বিস্তারের দিক দিয়ে প্রথমেই মানকচুর স্থান। এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকায় যেখানে গরম বেশি সেখানেই কচুর জন্মস্থান। ভারত-বর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই বর্তমানে মানকচুর চাষ হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ এর মাটির নীচেকার অংশ লম্বা কন্দটিই আমরা খেয়ে থাকি। এতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য থাকে। কোনও কোনও জাতের মানকচুতে একরকমের রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা খেলে গলায় জ্বালা হয়। কিন্তু মানকচুর অনেক উন্নত জাত আছে যার স্বাদের তুলনা নেই। মানকচুর পাতাও শাক হিসাবে খাওয়া হ'য়ে থাকে। এতে বেশ পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ 'এ' আছে।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

পাহাড়ে অঞ্চল সহ প্রায় সমস্ত জায়গাতেই মানকচু জন্মায়। কিন্তু যেখানে বৃষ্টিপাত বেশ বেশি সেখানেই মানকচুর ফলন ভাল হয়।

দোঁয়াশ মাটিই মানকচু চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। ভারী বা কাদা মাটিতে কচুর কন্দ ভাল বাড়তে পারে না। মাটিতে জল দাঁড়ালে কচুর ক্ষতি হয়। অম্লমাটিতে মানকচুর স্বাদ ভাল হয় না।

বীজ নির্বাচন ও বপনের সময় ঃ

মানকচুর মাটির নীচেকার অংশ বা লম্বা কন্দ যা আমরা খেয়ে থাকি তা কেটে কেটেই কচুর চাষ হ'য়ে থাকে।

পাহাড়ে এলাকায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে কচুর বীচন লাগানো হয়। সমতল ভূমিতে কচু লাগানো সুরু হয় ফাল্গুন মাস থেকেই। যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানে কচু লাগানো হয় আষাঢ় মাসে।

এক একর জমির জন্য মানকচুর বীজের প্রয়োজন ৪০০ কেজি. থেকে ৫০০ কেজি.।

জমি তৈরী ঃ

জমিতে কচুর বীজ লাগাবার মাসখানেক আগেই জমিতে লাঙ্গল দেওয়া প্রয়োজন। চার পাঁচবার চাষ দিয়েই কচু লাগাবার ভেলী তৈরী করতে হয়। দু' একবার চাষ দিয়েই একর প্রতি প্রায় ৩৭ কু. ৫০ কেজি. গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমিতে ছড়িয়ে মিশিয়ে দিতে হ'বে।

বীজ বপন ঃ

কচুর কন্দের ছোট ছোট টুকরো ৪৫ সেন্টিমিটার থেকে ৬০ সেন্টিমিটার (২৪ ইঞ্চি) দূরে দূরে ভেলীতে বসাতে হয়। প্রতি ভেলীতে এক একটি মানকচুর বীজ ২২·৫ সেন্টিমিটার থেকে ৩০ সেন্টি-মিটার (৯ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি) দূরে দূরে থাকবে। প্রতিটি বীজ ভেলীর ঠিক মাঝখানে মাটির সমতল থেকে ৭·৫ সেন্টিমিটার থেকে ১০ সেন্টিমিটার (৩ থেকে ৪ ইঞ্চি) নীচে গর্ত খুঁড়ে বসিয়ে আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে।

সার প্রয়োগ ঃ

মানকচুতে সাধারণতঃ জৈবসার দিলেই চলে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কাঠের ছাই দিলে মান-কচু ভাল হয়।

জলসেচ ঃ

মানকচুর বীজ জমিতে লাগাবার পরই একবার জলসেচ দিতে হয়। তারপর পাঁচ থেকে সাত দিন অন্তর সেচ দেওয়া ভাল যে পর্যন্ত বৃষ্টি না নামে।

পরিচর্যা ঃ

কচুর ভেলীগুলির মধ্যে আগাছা জন্মালে ভালভাবে পরিষ্কার

রাখতে হয়। সাধারণতঃ তিন থেকে চারবার হাত নিড়েন দেওয়া প্রয়োজন হয়। আর বর্ষার জলে ভেলীর মাটি ধুয়ে গেলে ত্ব' থেকে তিনবার মাটি তুলে ভেলীগুলি ভাল ক'রে বেঁধে দিতে হয়।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

ধসা রোগের আক্রমণে অনেক সময়ে মানকচু গাছের ক্ষতি হয়। কোনও জমিতে ধসা রোগের আক্রমণ দেখা গেলে পরের বছর সেই জমিতে মানকচুর চাষ না করাই ভাল। প্রতি ৪০০ লিটার জলে ত্বই কেজি. ব্লাইটক্স অথবা ফাইটোলান নামক ওষুধ মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে কচুর পাতায় ছিটিয়ে দিলে এই রোগ নিবারণ করা হয়। পাতার উপরে ও নীচে ত্ব'দিকেই যাতে সমান ভাবে ওষুধ ছিটানো হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে। ধসা রোগের আক্রমণ হ'লে প্রথমে পাতায় বাদামী রঙ এর দাগ দেখা যায় ; পরে পাতা ও ডাঁটা পচতে আরম্ভ করে। আক্রমণ বেশি হ'লে মাটির নীচের মানকচুও পচতে আরম্ভ করে। তাই রোগের আক্রমণ দেখা দিক্ আর না দিক তিন সপ্তাহ পর পর নিয়মিতভাবে ওষুধ ছিটিয়ে যেতে হবে।

সাধারণতঃ কোনও পোকার আক্রমণে মানকচু গাছের ক্ষতি হ'তে দেখা যায় না।

ফসল তোলা এবং ফলন ঃ

ভাদ্র-আশ্বিন মাস থেকেই মানকচু তোলা আরম্ভ হয় এবং তা অঘ্রাণ-পৌষ মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময়ে গাছের প্রায় সমস্ত পাতা শুকিয়ে যায়। কোদালের সাহায্যেই মাটি খুঁড়ে মানকচু তোলা হয়।

মানকচুর একর প্রতি ফলন প্রায় ৩৭ কু. ৫০ কেজি. থেকে ৫৬ কু. ২৫ কেজি. পর্যন্ত হয়।

জাত বা প্রকার ঃ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে মানকচুর স্থানীয় জাত বা প্রকার

ব্যবহার করা হয়। পাঞ্জাবে কচুর উচ্চফলনশীল জাত এস-১১ এবং এস-৩ মনোনীত করা হ'য়েছে।

সংরক্ষণ :

কচুর বিশেষ সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। ভালভাবে পাকা কচু ঠিকমত শুকিয়ে রাখলে প্রায় একবছর ঘরে রাখা যায়। কাঠের বা বাঁশের মাচায় ঝুলিয়ে রাখলে মানকচু ভাল থাকে।

খেতকচু

মানকচুর মত খেতকচুর চাষও ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। খুব সম্ভবতঃ আফ্রিকাই এর জন্মস্থান। আফ্রিকার ঘানা, নাইজিরিয়া প্রভৃতি দেশে কচুই প্রধান খাদ্য। মানকচুর ন্যায় এতেও প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য রয়েছে। কোনও কোনও জাতের কচুর এক একটি কন্দ আকারে খুব বড় হয় ; একটির ওজন ২৫ কেজি. থেকে ৩০ কেজি. পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণতঃ ছোট এবং মাঝারি জাতের খেতকচুই খাবার জন্য চাষ করা হয়।

খেতকচুর আবহাওয়া এবং মাটির প্রয়োজনীয়তা এবং চাষের নিয়ম মানকচুর মতই। কিন্তু খেতকচুর লতা ছড়িয়ে পড়ে বলে অনেক সময়ে বাঁশের মাচান ক'রে দেওয়া হয়।

ওল

ওলের চাষও ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যেই আছে। ভারতবর্ষই এর জন্মস্থান। ওলের কন্দ হয় গোলাকার। এতেও প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার এবং নানারকম ধাতব লবণ রয়েছে।

আবহাওয়া ও মাটি :

ওলের চাষ উঁচু পাহাড় থেকে আরম্ভ ক'রে সমতল ভূমি পর্যন্ত সব জায়গাতেই হ'য়ে থাকে।

দোঁয়াশ মাটিতেই ওল ভাল জন্মায়। লালমাটিতেও ওল ভালই হয়।

বীজ নির্বাচন ও বপনের সময় :

প্রথম বছর ছোট আকারের ওল মাটিতে বসানো হয়। এক বছর পর এগুলি তুলে নিয়ে আবার জমিতে বসানো হয়। এইভাবে পর পর তিন বছর তুলে তুলে অন্য জমিতে লাগানো হয়। চার বছর পর সমস্ত ওল তুলে ছোট ওলের কন্দগুলি পরের বছরের বীজের জন্য রেখে দেওয়া হয় আর বড়গুলি খাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

বর্ষার ঠিক আগে জ্যৈষ্ঠ মাসেই ওলের কন্দ জমিতে লাগাবার সময়। প্রতিটি কাটা ওলের টুকরো যা বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হ'বে তাতে দু'টি চোখ থাকা ভাল। প্রথম বছর লাগাতে ৪০০ কেজি. থেকে ৫০০ কেজি. ওলের বীজ বা কন্দ, এক একর জমিতে লাগাবার জন্য প্রয়োজন।

জমি তৈরী :

মানকচুর জমির মত ওলের জমিও চার পাঁচবার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে তৈরী করতে হয়। দু'একবার চাষ দিয়েই একর প্রতি প্রায় ৩৭ কু. ৫০ কেজি. গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমিতে ছড়িয়ে মিশিয়ে দিতে হয়।

বীজ বপন :

ওলের কন্দের ছোট ছোট টুকরো বা ছোট গোটা কন্দ ৪৫ সেন্টি-মিটার থেকে ৬০ সেন্টিমিটার (১৮ ইঞ্চি থেকে ২৪ ইঞ্চি) দূরে দূরে ভেলীতে বসাতে হয়। প্রতি ভেলীতে এক একটি ওলের বীজ ২২·৫ সেন্টিমিটার থেকে ৩০ সেন্টিমিটার (৯ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি) দূরে

দূরে থাকবে। প্রতিটি বীজ ভেলীর ঠিক মাঝখানে মাটির সমতল থেকে ৭·৫ সেন্টিমিটার থেকে ১০ সেন্টিমিটার (৩ থেকে ৪ ইঞ্চি) নীচে গর্ত খুঁড়ে বসিয়ে আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে।

সার প্রয়োগ :

জৈব সার ছাড়া ওলের জমিতে একর প্রতি ৪০ কেজি. ফসফরাস এবং ৪০ কেজি. পটাশিয়াম যুক্ত সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

জলসেচ :

ওল বর্ষাকালে জমিতে লাগানো হয় বলে সাধারণতঃ কোনও জলসেচের প্রয়োজন হয় না।

পরিচর্যা :

ওলের ভেলীগুলিতে আগাছা জন্মালে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে হ'বে। আর বর্ষার জলে ভেলির মাটি ধুয়ে গেলে দু'তিন বার মাটি তুলে ভেলীগুলি বেঁধে দিতে হ'বে।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার :

সাধারণতঃ ওলের জমিতে কোনও রোগ বা পোকার আক্রমণ দেখা যায় না।

শস্য পর্যায় :

ওলের জমিতে মাঝে মাঝে ওলের সাথে একত্রে চীনাবাদামের চাষ করা হ'য়ে থাকে। কলার সাথে মিশ্র ফসল হিসাবেও ওলের চাষ করা যেতে পারে।

ফসল তোলা ও ফলন :

পর পর তিন বছর এক জমি থেকে অন্য জমিতে ওল তুলে তুলে লাগাবার পর চতুর্থ বছরের ফসল কোদাল দিয়ে খুঁড়ে তোলা হয়। ছোট ওল থেকে প্রথম বছরে যে ওলের গাছ জন্মায় তাতে অনেকগুলি

পাতা থাকে। পাতাগুলির বোঁটাও থাকে বেশ মোটা। চতুর্থ বছরের ফসলে একটা বা দু'টোর বেশি পাতা থাকে না। কিন্তু তখন মাটির নীচের কন্দটি হ'য়ে ওঠে বিরাট। একটি ওলের গায়ে থাকে অনেক ছোট ছোট কন্দ। সমস্ত কন্দটির ওজন ১০ কেজি. থেকে ২০ কেজি. পর্যন্ত হ'তে পারে। গড়ে এক একর জমি থেকে প্রায় ৭৫ কু. থেকে প্রায় ১১২ কু. ৫০ কেজি. ওল পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক মতো সার দিয়ে যত্ন নিয়ে চাষ করলে একর প্রতি ১৮৭ কু. ৫০ কেজি. পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে।

জাত বা প্রকার ঃ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ওলের অনেক স্থানীয় জাত রয়েছে।

মূলা

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই সব্‌জি হিসেবে খাবার জন্যে মূলার চাষ হ'য়ে থাকে। মূলা কাঁচাও খাওয়া যায়, আবার স্যালাডেও দেওয়া যায়। মূলার পাতাও সব্‌জি হিসেবে খাওয়া যায়। এতে বেশ পরিমাণ ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'সি' রয়েছে। আর মূলার মূল যা আমরা সাধারণতঃ খেয়ে থাকি তার খাদ্যগুণও কম নয়। এতে শ্বেতসার তো রয়েছেই, তাছাড়া আছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা প্রভৃতি শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় ধাতব লবণ এবং কিছু পরিমাণ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এ. বি. এবং সি.।

মূলার জন্মস্থান ঠিক কোথায় সে সম্বন্ধে নানা মত আছে। খুব সম্ভবতঃ চীনদেশের মধ্যভাগে এবং ভারতেই প্রথমে মূলার চাষ সুরু হয়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

মূলা সাধারণতঃ শীতকালেই চাষ করা হ'য়ে থাকে। তবে

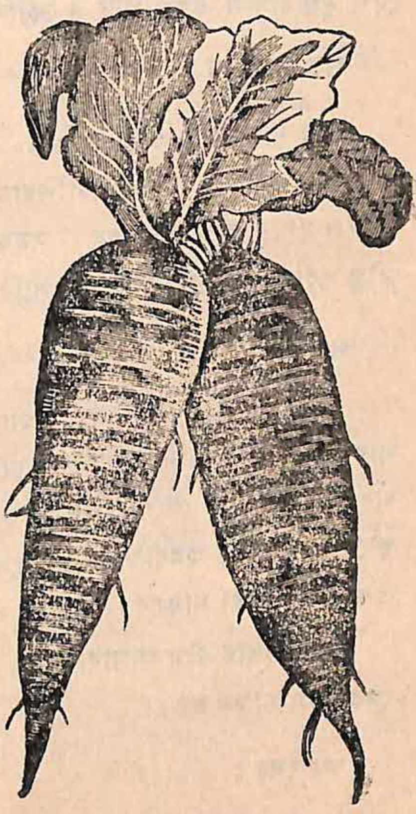
কিছুমাত্রায় গরমও মূলা সহ্য করতে পারে। কিন্তু তাপমাত্রা বেশ কম (৫০° ডিগ্রী ফারেনহিট থেকে ৬০° ডিগ্রী ফারেনহিটের মধ্যে) থাকলেই মূলার স্বাদ এবং গন্ধ ভাল হয়। সব রকম মাটিতেই মূলা জন্মায়। কিন্তু দোঁয়াশ মাটিতেই এর গঠন ও ফলন ভাল হয়।

জমি তৈরী :

চার পাঁচবার লাঙ্গল দিয়ে মূলার জমিটাকে ভাল করে তৈরী করে নিতে হ'বে। প্রথমবার লাঙ্গল দেবার পর একর প্রতি প্রায় ৫৬ কু. ২৫ কেজি. থেকে প্রায় ৭৫ কু. গোবর বা আবর্জনা পচা সার ছড়িয়ে মিশিয়ে দিতে হ'বে।

বপনের সময় এবং নিয়ম :

মূলার জাতগুলিকে প্রধানতঃ দু' ভাগে ভাগ করা যায়—দেশী বা ভারতীয় এবং বিদেশী বা ইউরোপীয়। দেশী মূলার বীজ শ্রাবণ মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোনও সময়ে বোনা যায়। কিন্তু বিদেশী মূলার বীজ আশ্বিন মাসের আগে বোনা যায় না। দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় সমস্ত বছরই গরম কম থাকে বলে বছরের যে কোন সময়েই মূলার বীজ বোনা যায়।


মূলা

মূলার বীজ সমতল জমিতেও বোনা যায় আবার

ভেলী তৈরী ক'রে ভেলীর উপরেও বোনা যায়। একটি ভেলী থেকে আর একটি ভেলী কত দূরে থাকবে তা মূলার জাতের উপর নির্ভর করে। বিদেশী মূলা যেগুলি বীজ বোনার ২০ থেকে ২৫ দিন পরই খাবার উপযুক্ত হয় সেগুলি একটু কাছাকাছি বোনা হয়। আবার দেশী মূলাগুলি বোনা হয় একটু দূরে দূরে। সমতল জমিতে মূলা লাগালে এক সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব রাখা হয় ৩০ সেন্টিমিটার (১২ ইঞ্চি)। ভেলীতে মূলার বীজ লাগালে ৭৫ সেন্টি-মিটার (৩০ ইঞ্চি) দূরে দূরে ভেলী বাঁধা হয়। ভেলীর মাঝখানে প্রায় ৩·৮ সেন্টিমিটার চওড়া নালী কেটে মূলার বীজ তাতে ফেলা হয়।

বিদেশী মূলার বীজ এক একর জমির জন্যে লাগে প্রায় ৫ কেজি.। দেশী মূলার বাজ একর প্রতি ৪ কেজিতেই চলে।

সার প্রয়োগঃ

জৈব সার ছাড়া একর প্রতি ৪০ কেজি. নাইট্রোজেন, ২০ কেজি. ফসফরাস এবং ২০ কেজি. পটাশিয়াম যুক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে মূলার ফলন ভাল হয়। সমস্ত রাসায়নিক সার একত্রে মিশিয়ে বীজ বোনার আগে সারিতে সারিতে মিশিয়ে দেওয়াই ভাল।

পরিচর্যাঃ

মূলার জমিতে আগাছা জন্মালে আগাছা তুলে ফেলতে হ'বে। সাধারণতঃ দু'বার নিড়েন দিলেই চলে। বীজ বোনার দশ বার দিন পর প্রতি সারি থেকে কিছু কিছু চারা তুলে পাতলা করে দিতে হ'বে। পাতলা করবার পর ১০ সেন্টিমিটার (৪ ইঞ্চি) দূরে দূরে এক একটি চারা থাকবে।

দেশী মূলার বীজ লাগাবার তিন সপ্তাহ পর গাছের গোড়ায় মাটি দেবার প্রয়োজন হয়।

জলসেচঃ

মূলার বীজ বোনার পরই অল্প জলসেচ দিতে হ'বে। তারপর

প্রথম কয়েকদিন একদিন অন্তর সেচ দেওয়া ভাল। চারাগুলি বেরিয়ে এলে জমির অবস্থা অনুযায়ী পাঁচ থেকে সাতদিন অন্তর জলসেচ দিতে হ'বে। বিদেশী মূলাতে চার পাঁচবার সেচ দিলেই চলে। কিন্তু দেশী মূলাতে সেচ লাগে প্রায় সাত থেকে আট বার।

মূলা উঠানো ও ফলন ঃ

মূলার শেকড় বেশ নরম থাকা অবস্থাতেই মূলা তুলে ফেলতে হ'বে। বিদেশী অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতের মূলা বীজ বোনার ২০ থেকে ২৫ দিন পরই তুলে ফেলতে হয়। কিন্তু দেশী অর্থাৎ ভারতীয় মূলা বীজ বোনার ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর তোলবার উপযুক্ত হয়।

বিদেশী সাদা মূলার ফলন একর প্রতি ৩০০০ কেজি. পর্যন্ত হয়। কিন্তু দেশী মূলার ফলন একর প্রতি ৬০০০ কেজি. থেকে ১২০০০ কেজি. পর্যন্ত হ'তে পারে।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

মূলার জমিতে সাধারণতঃ কোনও রোগ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে এক রকম জীবাণুর আক্রমণে পচন রোগের সৃষ্টি হয়। জল-নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি করলেই এই পচন নিবারণ করা যায়।

এক প্রকার জাব পোকা কখনও কখনও মূলার মাঠে দেখা যায়। জলে গোলা ডি. ডি. টি. ছিটিয়ে এর প্রতিকার করা যায়। প্রতি ৪০০ লিটার জলে এক কেজি. ডি. ডি. টি. মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটাতে হ'বে।

মূলার জাত বা প্রকার ঃ

মূলার জাতগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—দেশী এবং বিদেশী বা ইউরোপীয়।

দেশী মূলার মধ্যে নিম্নলিখিত জাতের নাম করা যেতে পারে—

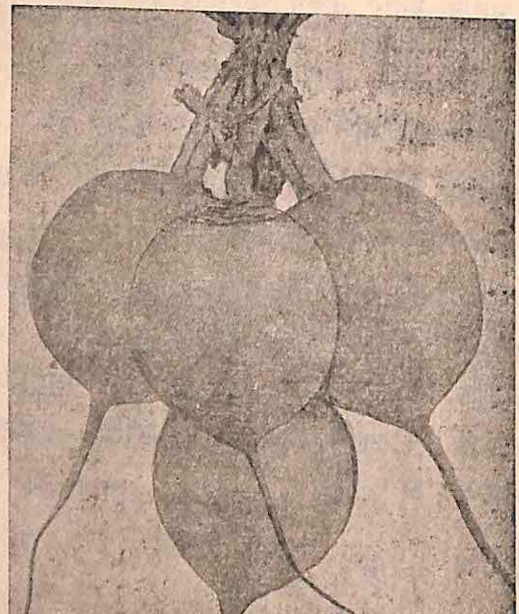
পুসা দেশী; জাপানীজ হোয়াইট, হোয়াইট লং, রেড লং, পার্পল লং, দেশী কনৌজ সাদা এবং স্কারলেট লং।

বিদেশী মূলার মধ্যে নীচে লেখা কয়েকটি জাতের চাষ আমাদের দেশে হ'য়ে থাকে।—হোয়াইট আইসিক্‌ল, স্কার্লেট গ্লোব এবং র‍্যাপিড রেড।

বিদেশী জাতের মূলা বেশি সুস্বাদু এবং মিষ্টি। দেশী মূলার ঝাঁঝ বেশি।

শালগম

শালগমের চাষ প্রধানতঃ উত্তর ভারতেই হ'য়ে থাকে; মূলার



শালগম

মত এরও মোটা মূলই আমরা সব্‌জি হিসেবে খেয়ে থাকি। স্যালাডে

কাঁচা শালগমও খাওয়া যায়। এর খাদ্যগুণ প্রায় মূলার মতই। কিন্তু এতে খাদ্যপ্রাণ 'এ' নেই। তবে খাদ্যপ্রাণ 'সি' কিছু বেশি পরিমাণে আছে।

শালগমের আদি জন্মস্থান এখন পর্যন্ত অজানাই রয়েছে। তবে রাশিয়া এবং সাইবেরিয়াতেই বুনো শালগম প্রথমে দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে মধ্যচীনে প্রথমে শালগমের চাষ সুরু হয়। আবার অনেকের ধারণা মধ্যএশিয়াতেই শালগমের চাষ প্রথমে দেখা যায়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

শালগমের আবহাওয়া এবং মাটির চাহিদা মূলার মতই।

জমি তৈরী ঃ

মূলার জমির মতই শালগমের জমি তৈরী করতে হয়।

বপনের সময় এবং নিয়ম ঃ

মূলার মতই শালগমের দু'টি প্রধান জাত আছে—দেশী এবং বিদেশী। দেশী শালগমের বীজ শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বোনা হয়। আর বিদেশী শালগমের বীজ বুনতে হয় আশ্বিনের শেষ এবং কার্তিক মাসে। পাহাড়ে এলাকায় ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ বোনা হয়।

এক একর জমিতে বুনবার জন্য দেড় কেজি. শালগমের বীজই যথেষ্ট। বীজ বোনার নিয়ম ঠিক মূলার মতই।

সার প্রয়োগ ঃ

জৈব সার ছাড়া একর প্রতি ৪০ কেজি. নাইট্রোজেন, ২০ কেজি. ফসফরাস এবং ২০ কেজি. পটাশিয়াম যুক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে শালগমের ফলন ভাল হয়।

মূলার মতই সমস্ত রাসায়নিক সার একত্রে মিশিয়ে বীজ বোনার আগে সারিতে সারিতে মিশিয়ে দিতে হয়।

পরিচর্যা :

শালগমের জমির পরিচর্যাও মূলার জমির মতই। বীজ বোনার দশ বার দিন পর প্রতি সারি থেকে কিছু কিছু চারা তুলে তুলে পাতলা করে দিতে হ'বে। পাতলা করবার পর ১০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে এক একটি শালগমের চারা প্রতি সারিতে থাকবে। জমিতে আগাছা দেখা দিলেই পরিষ্কার করে ফেলতে হ'বে। সাধারণতঃ শালগমের জমিতে দু'বার নিড়েন দিতে হয়।

জলসেচ :

শালগমের বীজ বোনার পরই অল্প জলসেচ দিতে হ'বে। তারপর মূলার মতই প্রথম কয়েকদিন একদিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারাগুলি বেরিয়ে এলে পাঁচ থেকে সাতদিন অন্তর জলসেচ দিতে হ'বে।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার :

শালগমের জমিতে সাধারণতঃ কোনও রোগ দেখা যায় না।

জাবপোকা এবং এক প্রকার বাঘা পোকা অনেক সময়ে শালগমের ক্ষতি করে। জলে গোলা ডি. ডি. টি. ছিটিয়েই এই পোকার দমন করতে হয়। প্রতি ৪০০ লিটার জলে এক কেজি ডি. ডি. টি. মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটানো হয়। দু' সপ্তাহ অন্তর দু'বার ওষুধ ছিটানো ভাল।

শালগম উঠানো এবং ফলন :

মূলার মত শালগমও শেকড় বেশ নরম থাকা অবস্থাতেই তুলে ফেলতে হ'বে।

এক একর জমি থেকে ৮০০০ কেজি. থেকে ১৬০০০ কেজি. পর্যন্ত শালগম পাওয়া যেতে পারে।

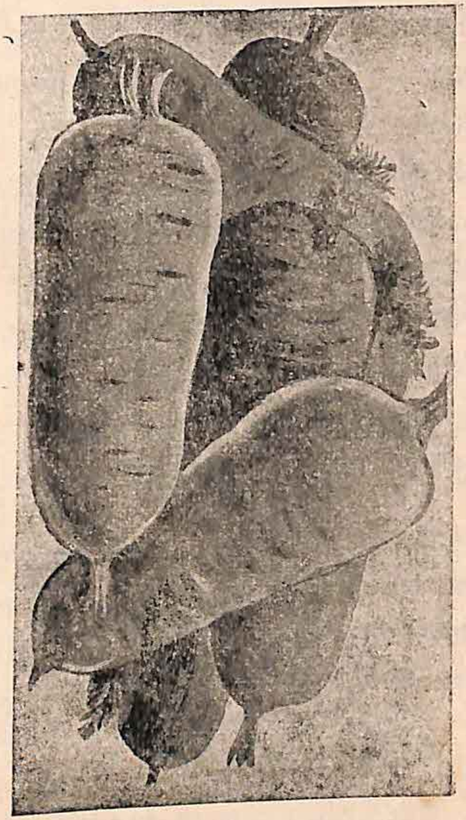
জাত বা প্রকার ঃ

দেশী জাতের শালগমের মধ্যে পুসা কাঞ্চন এবং পুসা চন্দ্রিমার নাম করা যেতে পারে।

বিদেশী জাতের শালগমের মধ্যে পার্পল টপ, হোয়াইট গ্লোব, স্নো বল, গোল্ডেন বল এবং রেড টপের চাষ করা হয়।

গাঁজর

বর্তমানে গাঁজরের চাষও ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যেই করা হয়। গাঁজর সব্‌জি হিসেবে তো খাওয়া চলেই, কাঁচা গাঁজরও অনেকে খেয়ে থাকে। স্যালাডে গাঁজর খুবই সুস্বাদু। নানারকম মিষ্টি খাবারও গাঁজর দিয়ে তৈরী করা হয়। এর পুষ্টিমূল্যও অন্যান্য মাটির তলার ফসলের তুলনায় অনেক বেশি। কমলা রঙের গাঁজরে প্রচুর ক্যারোটিন রয়েছে যা থেকে তৈরী হয় খাদ্যপ্রাণ 'এ'। তাছাড়া, এতে খাদ্য-প্রাণ 'বি'-ও আছে। গাঁজরের সবুজ



গাঁজর

পাতাতে-ও প্রোটিন, প্রচুর ধাতব লবণ এবং খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। এই পাতা গরু, ঘোড়া প্রভৃতির খুব উন্নত জাতের খাদ্য।

খুব সম্ভবতঃ পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের পাহাড়ে এলাকাই গাঁজরের জন্মস্থান। বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতেই গাঁজরের চাষ ছড়িয়ে পড়েছে।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

মূলা এবং শালগমের মত গাঁজরও শীতের ফসল। কোনও কোনও দেশী জাতের গাঁজর একটু বেশী গরমও সহ্য করতে পারে। ৫০° ডিগ্রী ফারেনহিট থেকে ৬০° ডিগ্রী ফারেনহিটের মধ্যে জন্মালে গাঁজরের রঙ খুব ভাল হয় না। তাপমাত্রা ৬০° ডিগ্রী ফারেনহিট থেকে ৭০° ডিগ্রী ফারেনহিটের মধ্যে থাকলে গাঁজরের রঙ সবচেয়ে ভাল হয়। আবার তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি হ'লে রঙ মোটেই ভাল হয় না।

উর্বর বেলে দোঁয়াশ মাটিতেই গাঁজর ভাল জন্মায়। মাটিতে অম্লত্বের ভাব বেশি থাকলে গাঁজর ভাল হয় না। মাটির অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মাত্রা বা পি. এইচ. ৬·৫ এর কাছাকাছি থাকলে গাঁজর সবচেয়ে ভাল হয়।

জমি তৈরী ঃ

মূলার জমির মত চার পাঁচবার লাঙ্গল দিয়ে গাঁজরের জমি তৈরী করতে হয়। প্রথমবার লাঙ্গল দেবার পরই একর প্রতি ১০০ মণ থেকে ৫০ মণ গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমিতে ছড়িয়ে দিতে হ'বে। গাঁজরের জমিতে কখনও কাঁচা গোবর দিতে নেই। কাঁচা গোবর দিলে গাঁজরের মূলের শাখা প্রশাখা হয়।

বপনের সময় এবং নিয়ম ঃ

সমতল ভূমিতে ভাদ্রমাস থেকে অঘ্রাণ মাসের মধ্যে গাঁজরের বীজ বোনা হয়। দেশী গাঁজরের বীজ আশ্বিন মাসের মধ্যেই বোনা ভাল।

ঠাণ্ডা পড়ে গেলে গাঁজরবীজের অঙ্কুর বেরিয়ে আসতে খুব দেরী হয়। বিদেশী বা ইউরোপীয় গাঁজরের বীজ একটু ঠাণ্ডা পড়লে পরে কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে বোনাই ভাল। দুই এক সপ্তাহ পর পর কিছু কিছু ক'রে গাঁজরের বীজ লাগানো ভাল; তাতে অনেকদিন ধরে গাঁজর খাওয়া যায়। পাহাড়ে এলাকায় ফাল্গুন মাস থেকে বৈশাখ মাসের মধ্যে গাঁজরের বীজ বোনা হয়।

সাধারণতঃ মাটির সমতলে ২৫ সেন্টিমিটার (১০ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে গাঁজরের বীজ বোনা হয়। বীজগুলি মাটির সমতল থেকে আধ ইঞ্চির বেশি নীচে দিতে নেই।

এক একর জমিতে বুনবার জন্যে ২ কেজি. থেকে ৩ কেজি. গাঁজরের বীজ লাগে।

সার প্রয়োগ ঃ

জৈব সার ছাড়া একর প্রতি ৪০ কেজি. নাইট্রোজেন, ২০ কেজি. ফসফরাস এবং ২০ কেজি. পটাশিয়াম যুক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে গাঁজরের ফলন ভাল হয়। রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের অর্ধেক এবং সমস্ত ফসফরাস এবং পটাশিয়াম ঘটিত সার গাঁজরের বীজ বুনবার আগে জমিতে ছিটিয়ে বা সারিতে দিতে হয়। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন দিতে হ'বে বীজ বুনবার তিন সপ্তাহ পর চারার সারির দু'পাশে ছিটিয়ে। তারপর ভাল ক'রে সেই সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হ'বে।

পরিচর্যা ঃ

গাঁজরের জমিতে মূলা এবং শালগমের চাইতে অনেক বেশি আগাছা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। দু'বার হস্ত বিদা চালান ভাল। গাঁজরের জমির আগাছা নষ্ট করবার জন্য নানারকম ওষুধও ব্যবহার করা হয়। ষ্টোডার্ড সলভেন্ট নামে ওষুধ আগাছা দমনে খুব ভাল কাজ করে। গাঁজর জমি থেকে তোলবার অন্ততঃ তিন সপ্তাহ আগে এই ওষুধ ব্যবহার করা বন্ধ করতে হ'বে।

জলসেচ ঃ

গাঁজরের বীজ বোনার পরই অল্প জলসেচ দিতে হ'বে। তারপর চারা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত রোজ অল্প জল দেওয়া ভাল। চারাগুলি বেরিয়ে এলে পর চার পাঁচদিন অন্তর জল দেওয়া প্রয়োজন। গাঁজরের জমিতে মোট দশ থেকে বার বার জলসেচ প্রয়োজন হয়।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

গাঁজরের জমিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ বিশেষ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে এক প্রকার জীবাণু ঘটিত পচন রোগ দেখা যায়। কদাচিৎ একপ্রকার ধসা রোগেরও আক্রমণ হয়। এ রোগের আক্রমণ হ'লে পাতায় বাদামী রঙের দাগ পড়ে এবং ধীরে ধীরে পাতা পচতে আরম্ভ করে। ফলে গাঁজরের ফলন কমে যায়। আশে-পাশের কোন জমিতে ধসা রোগের লক্ষণ দেখা গেলে ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান নামক ওষুধ জলে মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। ২০০ লিটার জলে এক কেজি. ওষুধ মিশিয়ে এক একর জমিতে ছিটানো চলবে।

গাঁজর তোলা ও ফলন ঃ

গাঁজর পুরোপুরি পাকবার আগেই কিছু কিছু ক'রে তুলে খাওয়া ভাল। মাটি বেশ নরম থাকা অবস্থাতেই কোদাল বা খুরপি দিয়ে জমি থেকে গাঁজর তোলা হয়।

দেশী গাঁজর জমি থেকে তুলতে প্রায় দু' থেকে তিন মাস লাগে। তার ফলন হয় একর প্রতি ৮০০০ কেজি. থেকে ১২০০০ কেজি.। বিদেশী গাঁজর তুলতে হয় তিন থেকে চার মাস পর। খেতে সুস্বাদু হলেও বিদেশী গাঁজরের ফলন কম। একর প্রতি সাধারণতঃ ৬০০০ কেজি.-র বেশী পাওয়া যায় না। কিন্তু ইউরোপীয় বা বিদেশী গাঁজর একবার বুনে দু'বছর জমিতে রাখা যায়। পরের বছর আবার তা থেকে গাঁজর হয়।

গাঁজরের জাত বা প্রকার ঃ

মূলো এবং শালগমের মত গাঁজরের যে সমস্ত জাতের চাষ করা হ'য়ে থাকে তাদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়—দেশী এবং বিদেশী বা ইউরোপীয়। দেশী গাঁজরের মধ্যে লাল, হলদে এবং কালো তিনটে রঙ দেখা যায়। উন্নত জাতের মধ্যে পুসা কেশরই প্রধান। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা ইউরোপীয় জাতির সাথে মিশিয়ে এই শঙ্কর জাতের গাঁজর বের করেছে।

ইউরোপীয় বা বিদেশী জাতের গাঁজরের মধ্যে হাফলং স্থানটিস, স্কারলেট হর্ণ, ব্যান্টনে, ড্যানভার্স, ইম্পারেটর এবং স্ট্রীম লাইনস্ এর নাম করা যেতে পারে।

গাঁজরের বীজ তৈরী ঃ

দেশী জাতের গাঁজরের বীজ সমতল এলাকাতেই তৈরী করা সম্ভব। কিন্তু ইউরোপীয় জাতের বীজের জন্য চাষ করতে হয় পাহাড়ে। ভাল জাতের বীজ তৈরী করার জন্য ভাল সুস্থ গাঁজরের চারা বেছে নিয়ে অন্য জায়গায় রোপণ করতে হয়। বীজের জন্য কোনও এক জাতের গাঁজর যেখানে লাগানো হ'বে তার দু' মাইলের ভেতর অন্য কোনও জাতের গাঁজর লাগানো চলবে না।

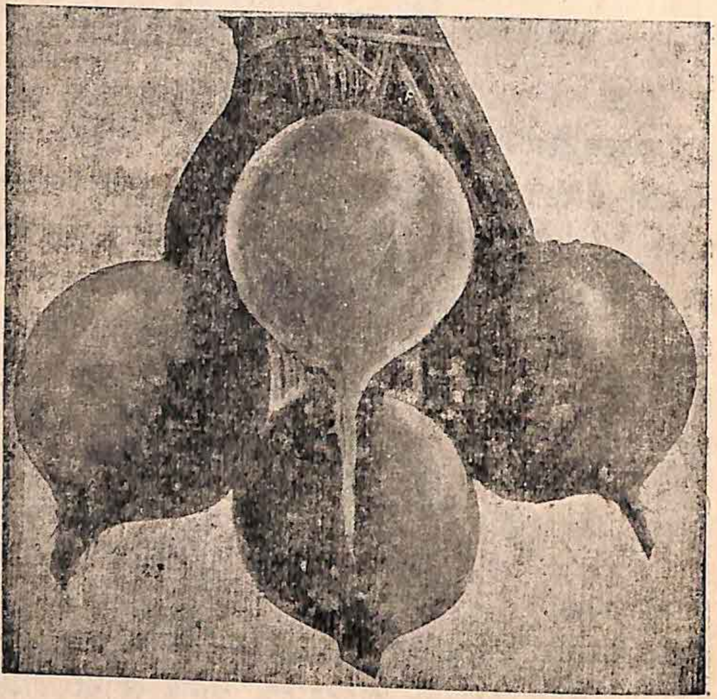
বীট

বীট ইউরোপের এবং উত্তর আমেরিকার অনেক দেশের একটি প্রধান সব্‌জি। বর্তমানে ভারতবর্ষের কোনও কোনও রাজ্যেও বীটের চাষ হ'চ্ছে। কিন্তু এর চাষ মূলা, শালগম এবং গাঁজরের তুলনায় অনেক কম। সব্‌জি হিসেবে ছাড়া স্যালাডের সাথে কাঁচা বীটও খাওয়া যায়। বীটে বেশ কিছু পরিমাণ ধাতব লবণ এবং সামান্য খাদ্যপ্রাণ 'সি' রয়েছে। কিন্তু এতে খাদ্যপ্রাণ 'এ' একদম নেই।

বীটের জন্মস্থান ঠিক কোথায় এ বিষয়ে নানা মতামত রয়েছে। নানাজনের মতে ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া অথবা আফ্রিকা বীটের জন্মস্থান। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে বীটের চাষ ছিল। কিন্তু সে সময়ে বীটের পাতাই শুধু খাওয়া হত।

আবহাওয়া এবং মাটি :

সাধারণতঃ শীতকালেই বীটের চাষ হয়। কিন্তু বেশ গরমেও এর চাষ করা চলে। তবে ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেই বীটে চিনির



বীট

পরিমাণ বাড়ে। চিনির পরিমাণ কম হ'লে বীটের রঙ ভাল হয় না। আবার তাপমাত্রা ৫০° ডিগ্রী ফারেণহিটের কম হ'লে বীটের আকার খুব ছোট থাকা অবস্থাতেই গাছে ফুল এসে যায়।

সবরকম মাটিতেই বীটের চাষ করা চলে। তবে মাটি মোটা-

মোটামুটি ঝুরঝুরে থাকতে হ'বে যাতে বীটের মূল মাটির নীচে স্বাভাবিক আকারে আসতে পারে। মাটির অম্লতার মাত্রা বেশি হ'লেও বীট ভাল হয় না। অন্যান্য মাটির তলার ফসলের মত উর্বর, বেলে দোঁয়াশ মাটিতেই বীট সবচেয়ে ভাল ফলন দেয়।

জমি তৈরী ঃ

গাঁজরের জমির মতই চার পাঁচ বার লাঙ্গল দিয়ে বীটের জমি তৈরী করতে হয়। প্রথমবার লাঙ্গল দেবার পরই একর প্রতি প্রায় ৩৭ কু. ১৮½ কেজি. (১০০ মণ) গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমিতে ছড়িয়ে দিতে হ'বে।

বপনের সময় এবং নিয়ম ঃ

সাধারণতঃ আশ্বিন মাসের শেষ দিক থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত বীটের বীজ বোনা হয়। বীটের বীজ যা বোনা হয় তা এক একটি ফল। একটি ফলের মধ্যে দুই থেকে পাঁচটি পর্যন্ত বীজ থাকে। বীটের ফলগুলি জমিতে বুনবার অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর ভাল করে ধুয়ে জমিতে বুনতে হয়। পাহাড়ে এলাকায় ফাল্গুন মাস থেকে বৈশাখ মাসের মধ্যে বীটের বীজ বোনা হয়।

সাধারণতঃ মাটির সমতলে ২৫ সেন্টিমিটার (১০ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে বীটের বীজ বোনা হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে দুই ইঞ্চি গভীর নালী করে প্রতি নালীতে একর প্রতি ১৫ কেজি. অলড্রিন, ক্লোরড্রিন অথবা হেপ্টাক্লোর নামক কীটনাশক ওষুধ আর রাসায়নিক সার মেশাতে হয়। কীটনাশক ওষুধ নালীতে না দিলে পিঁপড়ে বীটের বীজ খেয়ে ফেলে। প্রতি নালীতে ওষুধ এবং রাসায়নিক সার ভালভাবে মিশিয়ে জমির সমতলের আধ ইঞ্চি নীচে বীটের বীজ লাগিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলায় বীটের চারা তৈরী করে তিন সপ্তাহ পর সেই চারা তুলে জমিতে লাগিয়েও বীটের চাষ করা যায়। জমিতে চারা

লাগাবার সময়ে ২৫ সেন্টিমিটার (১০ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে লাগানো হয়। প্রতি সারিতে ১০ সেন্টিমিটার (৪ ইঞ্চি) দূরে দূরে এক একটি চারা থাকবে। বীটের বীজতলায়ও অলড্রিন জাতীয় কীটনাশক ওষুধ অবশ্য দিতে হ'বে।

এক একর জমির জন্য ২ কেজি. থেকে ৩ কেজি. বীটের বীজ লাগে।

সার প্রয়োগ :

জৈব সার ছাড়া একর প্রতি ৪০ কেজি. নাইট্রোজেন, ২০ কেজি. ফসফরাস এবং ২০ কেজি. পটাশিয়াম যুক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে বীটের ফলন ভাল হয়। রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের অর্ধেক এবং সমস্ত ফসফরাস এবং পটাশিয়াম ঘটিত সার বীটের বীজ বা চারা লাগাবার আগে প্রতি সারিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন দিতে হবে বীজ বুনবার তিন সপ্তাহ অথবা চারা লাগাবার ছু' সপ্তাহ পর। চারাগুলির সারির ছু'পাশে সার ছিটিয়ে ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পরিচর্যা :

বীটের প্রতিটি বীজ থেকে ছুটি থেকে পাঁচটি চারা জন্মায়। তাই চারাগুলি পাতলা ক'রে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বীজ বুনবার তিন সপ্তাহ পর জমি থেকে অনেক চারা তুলে সেই চারা অন্য জমিতে লাগানো ভাল। যে চারা তুলে অন্য জায়গায় লাগানো হয় তার ফলন অনেক বেশি হয়। ছু' তিনবার বীটের জমিতে নিড়েন দেওয়া প্রয়োজন। লবণ জল স্প্রে ক'রে বীটের জমির আগাছা নষ্ট করা যায়। বীটের চারার তিনটি থেকে পাঁচটি পাতা হ'লেই স্প্রে দেওয়া ভাল। পাঁচ লিটার জলে এক লিটার লবণ মিশিয়ে স্প্রে ক'রতে হ'বে

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

এক রকম ছত্রাকের আক্রমণে মাঝে মাঝে বীটের চারার গোড়া-পচা রোগ হ'তে দেখা যায়। যে জমিতে এই রোগ দেখা যায় সে জমিতে পরের বছর বীট, আলু টম্যাটো, লেটুস আর পাটের চাষ বন্ধ রাখতে হ'বে। কারণ, একই ছত্রাক এই সবক'টি ফসলকে আক্রমণ করে গোড়াপচা রোগের সৃষ্টি করে। ঐ জমিতে কিছুদিন এ সমস্ত ফসলের চাষ বন্ধ রাখলে মাটির মধ্যেকার ছত্রাকের জীবাণু মরে যাবে। জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ চুন প্রয়োগ করেও এ রোগের দমন করা যায়। কারণ, অম্লভাব দেখা দিলেই এ রোগ বেড়ে যায়।

এক রকম কাঁঠালে পোকা মাঝে মাঝে বীটের চারা খেয়ে নষ্ট করে। এ পোকার আক্রমণ দেখা গেলে ডি. ডি. টি. গুঁড়ো জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হ'বে। প্রতি ২০০ লিটার জলে এক কেজি. ডি. ডি. টি. মেশাতে হ'বে।

ফসল উঠানো ও ফলন ঃ

গাঁজরের মত বীটও পুরোপুরি পাকবার আগেই কিছু কিছু ক'রে তুলে খাওয়া ভাল। মাটি বেশ নরম থাকা অবস্থাতেই কোদাল বা খুরপি দিয়ে জমি থেকে বীট তুলতে হ'বে।

বীট জমি থেকে তুলতে দু'মাস থেকে তিন মাস লাগে। এক একর জমি থেকে ৮০০০ কেজি. থেকে ১০,০০০ কেজি. পর্যন্ত বীট পাওয়া যায়।

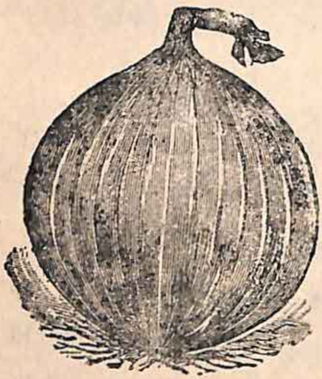
জাতি বা প্রকার ঃ

বীটের জাতগুলির মধ্যে ক্রিমসন গ্লোব এবং 'ডেট্রয়েট ডার্করেড' ভাল ফলন দেয়।

পেঁয়াজ

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পেঁয়াজের চাষ রয়েছে। এতে বেশ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ 'বি' রয়েছে, খাদ্যপ্রাণ 'সি'-ও কিছু পরিমাণে আছে। কিন্তু খাদ্যমূল্যের জন্য পেঁয়াজের এত কদর নয়, এর প্রধান ব্যবহার মশলা হিসাবে সব্‌জি এবং মাছ ও মাংসের রান্না করা খাবার সুস্বাদু করবার জন্য। তাছাড়া স্যালাড এবং আচারেও পেঁয়াজ না হ'লে চলে না।

মধ্য এশিয়াকেই পেঁয়াজের জন্মস্থান বলা হয়। বর্তমানে এশিয়ার সমস্ত দেশ ছাড়াও উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ,, ইউরোপের স্পেন এবং ইতালী, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলেও বেশ ব্যাপকভাবে পেঁয়াজের চাষ করা হ'য়ে থাকে। আমাদের ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার একর জমিতে পেঁয়াজের চাষ করা হয়। তার মধ্যে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র-প্রদেশ, বিহার এবং আসামেই এর চাষ বেশি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও ২০,০০০ একর জমিতে পেঁয়াজের চাষ করা হ'য়ে থাকে। প্রতি বছর ভারতবর্ষ থেকে প্রায় দশলক্ষ মণ পেঁয়াজ বিদেশে রপ্তানী করা হয়। জাপান, মালয়, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, হংকং, পূর্ব আফ্রিকা এবং ইরানেই বেশি পেঁয়াজ এদেশ থেকে রপ্তানী করা হয়।



পেঁয়াজ

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

পেঁয়াজ শীতের ফসল। সমুদ্র সমতল থেকে আরম্ভ ক'রে উঁচু পাহাড় এলাকাতেও যেখানে তাপমাত্রা ৬০° ডিগ্রী ফারেনহাইটের

নীচে যায় না সেখানেই পেঁয়াজের চাষ হ'তে পারে। পেঁয়াজের চাষের সময়ে বেশি বৃষ্টি হ'লে গাছ মরে যাবে। যেখানে পেঁয়াজ মাঠে জন্মাবার সময়ে প্রায় ৭৫ সেমি. (৩০" ইঞ্চির) বেশি বৃষ্টিপাত হয় সেখানে পেঁয়াজের চাষ চলবে না। তাই পাহাড়ে এলাকায় যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানেই গ্রীষ্মকালে পেঁয়াজের চাষ হ'তে পারে। অন্য সমস্ত জায়গায় শুধু শীতকালেই পেঁয়াজের চাষ করা হ'য়ে থাকে।

দোঁয়াশ মাটিতেই পেঁয়াজের চাষ সবচেয়ে ভাল হয়। লাল মাটিতেও পেঁয়াজের চাষ হ'তে পারে যদি তাতে বালির ভাগ বেশ বেশি থাকে। কাদা মাটিতে পেঁয়াজের চাষ না করাই ভাল। পেঁয়াজের জন্য সব সময়ে খুব বেশি উর্বর মাটির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ক্ষারযুক্ত জমি অথবা নীচু জলাজমিতে পেঁয়াজের চাষ করা চলবে না। আবার বেশি অম্ল জমিতেও পেঁয়াজ ভাল হয় না। অম্লত্ব ক্ষারত্বের মাত্রা বা পি. এইচ. ৫·৬ থেকে ৬·৫ এর মধ্যে পেঁয়াজ ভাল ফলন দেয়।

বীজ নির্বাচন ও বপনের সময় ঃ

সাধারণতঃ বীজতলায় বীজ বুনে পেঁয়াজের চারা তৈরী করা হয়। পরে সেই চারা তুলে মাঠে লাগিয়ে পেঁয়াজের চাষ করা হয়। সুস্থ, নীরোগ গাছের বীজ বেছে নিতে হ'বে। সাধারণতঃ তু'বছরের বেশি পেঁয়াজের অঙ্কুর দেবার ক্ষমতা থাকে না। তাই পুরোনো বীজ ব্যবহার করা চলবে না। চারা তৈরী করবার জন্য তাজা বীজ কিনতে হবে।

উত্তর ভারতের সমস্ত জায়গায় আশ্বিন-কার্তিক থেকে কার্তিক-অগ্রাণ মাসের মধ্যে বীজতলায় পেঁয়াজের বীজ বোনা হয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও এটাই পেঁয়াজের চারা তৈরী করবার সময়। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের কোনও কোনও এলাকায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতেই পেঁয়াজের বীজ বোনা হয়। তারপর সেই বীজ থেকে গজানো চারা ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আগেকার জমি থেকে

তুলে আবার নতুন জমিতে লাগানো হ'য়ে থাকে। পাহাড়ে এলাকায় সাধারণতঃ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পেঁয়াজের বীজ বীজতলায় ফেলা হয়। কিন্তু যেখানে শীত কম সেখানে ভাদ্র-আশ্বিন মাসের বীজতলায় বীজ ফেলা হ'য়ে থাকে।

জমি তৈরী ঃ

চার পাঁচবার লাঙ্গল দিয়ে পেঁয়াজের জমিটাকে বেশ ভাল ক'রে তৈরী ক'রে নিতে হ'বে। খুব বেশি গভীর ক'রে লাঙ্গল দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ পেঁয়াজের মূল মাটির উপর থেকে তিন থেকে চার ইঞ্চির বেশি নীচে যায় না। প্রথম চাষ দেবার পর একর প্রতি প্রায় ৫৬ কু. থেকে ৭৪ কু. ৪০ কেজি. (১৫০ থেকে ২০০ মণ) গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমিতে ছড়িয়ে দিতে হ'বে যাতে সারটা ভালভাবে জমির সাথে মিশে যেতে পারে। শেষ চাষ দেবার সময়ে রাসায়নিক সার জমিতে মিশিয়ে দিতে হ'বে।

জমিতে পেঁয়াজের চারা লাগাবার প্রণালী ঃ

জমিতে পেঁয়াজ লাগাবার তিনটি নিয়ম চালু আছে।

(১) প্রথম নিয়মে বীজতলায় পেঁয়াজের চারা তুলে পরে জমিতে চারা রোয়া করতে হয়।

(২) দ্বিতীয় নিয়মে পেঁয়াজের কন্দ সরাসরি জমিতে লাগানো হয়।

(৩) তৃতীয় নিয়মে জমিতে সরাসরি বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বীজ বুনে পেঁয়াজের চাষ করা হয়।

যেখানে সেচের সুবিধা রয়েছে সেখানে বীজতলায় পেঁয়াজের চারা তৈরী ক'রে পরে রোয়া ক'রাই সাধারণ চলতি নিয়ম। কারণ, এতে পেঁয়াজের আকার বড় হয় এবং ফলনও অনেক বেশি হয়। যেখানে জলের খুব অভাব সেখানে জমিতে সরাসরি বীজ বোনা হয়। কিন্তু তাতে পেঁয়াজের ফলন অনেক কম হয়। সরাসরি

পেঁয়াজের কন্দ লাগিয়ে চাষ করলে উপরের দু'রকম নিয়মের মাঝামাঝি হয়।

পাহাড়ে এলাকায় যেখানে পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে পেঁয়াজের চাষ করা হয় সেখানে পেঁয়াজের কন্দ লাগিয়ে চাষ করাই লাভজনক। কারণ, বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য জমির ঢালে জল গড়ানোর ফলে অনেক চারা নষ্ট হয়।

নীচে তিনটি প্রণালীতে পেঁয়াজের চাষের বিস্তারিত নিয়ম লেখা হ'ল।

১। রোয়া প্রণালী :

এই নিয়মে প্রথমে বীজতলায় পেঁয়াজের চারা তৈরী করা হয়। তারপর এই চারা সাবধানে তুলে জমিতে রোয়া করা হয়।

বীজতলায় পেঁয়াজের চারা তৈরী :

পেঁয়াজের বীজতলার জন্য উর্বর, বেলে দোঁয়াশ মাটিযুক্ত জমি বেছে নিতে হ'বে যা বেশ উঁচু এবং জলনিকাশের সুবিধা রয়েছে। প্রথমে জমিটা ভাল করে চাষ দিয়ে বা কুপিয়ে দশ থেকে পনেরো দিন রেখে দিতে হ'বে। তারপর আগাছা ভাল ক'রে বেছে নিয়ে আরও তিন চার বার চাষ দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে ক'রে নিতে হ'বে। শেষ চাষ দেবার সময়ে একর প্রতি প্রায় প্রায় ৭৪ কু. ৪০ কেজি. (২০০ মণ) পাতাপচা বা আবর্জনাপচা সার দিতে হ'বে। জমি খুব ভাল ক'রে তৈরী হ'বার পর ৩০০ সেমি. (দশ ফুট) লম্বা এবং ১২০ সেমি. (চার ফুট) চওড়া ক'রে এক একটি বীজতলা তৈরী করতে হ'বে। প্রতি বীজতলা জমির সমতল থেকে ১০ সেমি. (চার ইঞ্চি) থেকে ১৫ সেমি. (ছয় ইঞ্চি) উঁচু থাকবে। প্রতিটি বীজতলার মধ্যে ৩০ সেমি. থেকে ৪৫ সেমি. (১২ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি) ফাঁক থাকবে। মাঝের এই ফাঁকগুলি থাকলে বীজতলার যত্ন নেবার সুবিধা হয়।

বীজতলায় বীজবোনার দিন দশেক আগে প্রতি বীজতলায় আর একমণ আবর্জনা পচা সার এবং একশত গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট

ভাল করে মিশিয়ে দিতে হ'বে। এর উপর কিছু পরিমাণ কাঠের ছাই দিয়ে বীজতলার উপর দিকটা সমান ক'রে দিতে হয়। বীজ বোনার ঠিক আগে বীজতলায় সামান্য কিছু আগাছা থাকলে তাও ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে নিতে হ'বে।

৩০০ সেমি. লম্বা ১২০ সেমি. চওড়া (১০ ফুট লম্বা ৪ ফুট চওড়া) প্রতিটি বীজতলায় বোনার জন্য ৫০ গ্রাম থেকে ৬০ গ্রাম পেঁয়াজের বীজ লাগবে। যতটা জমিতে পেঁয়াজের চারা লাগানো হ'বে তার চারা তৈরী করতে বিশ ভাগের এক ভাগ বীজতলার জমি দরকার। তাই এক একর জমিতে বোনার জন্য ৩০০ সেমি. লম্বা ও ১২০ সেমি. চওড়া (১০ ফুট লম্বা ৪ ফুট চওড়া) ৫০টি থেকে ৫৫টি বীজতলার প্রয়োজন হ'বে। প্রতি একর জমির জন্য আড়াই কেজি. থেকে তিন কেজি. পেঁয়াজের বীজ প্রয়োজন। বীজতলায় বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে খুব সাবধানে ১$\frac{1}{4}$ সেমি. (আধ ইঞ্চি) পরিমাণ ঝুরঝুরে মাটি দিরে ঢেকে দিতে হ'বে।

বীজবোনার পর খুব সাবধানে উপর উপর অল্প অল্প জল ছিটিয়ে দিতে হ'বে। তিন চার দিন পর পর এভাবে অল্প পরিমাণ জল দেওয়া প্রয়োজন। দশ পনেরো দিন পর চারাগুলি ভালভাবে দাঁড়িয়ে গেলে এক সপ্তাহ পর পর জল দিলেই চলবে। জল দেবার সাথে সাথে মাঝে মাঝেই বীজতলার আগাছা পরিষ্কার ক'রতে হ'বে। আগাছা পরিষ্কার করবার সময়ে দেখতে হ'বে যেন চারাতে কোনও আঘাত না লাগে।

বীজতলায় বীজ বোনার ছয় থেকে আট সপ্তাহ পর জমিতে চারা লাগাবার উপযুক্ত হ'বে। এ সময়ে প্রতিটি চারা ১৫ সেমি. (ছয় ইঞ্চি) মত উঁচু হ'বে।

জমিতে চারা রোপণ :

পেঁয়াজের জমি ভাল ক'রে তৈরী ক'রে নিয়ে সমস্ত জমিটাকে ছোট ছোট প্লট বা খণ্ডে ভাগ করতে হ'বে। এতে জলসেচের

সুবিধা হয়। ১৫ সেন্টিমিটার (৬ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে পেঁয়াজের চারা রোয়া করা হয়। প্রতি সারিতে একটি চারা থেকে আর একটি চারা ৭ সেন্টিমিটার থেকে ১০ সেন্টিমিটার (৩ থেকে ৪ ইঞ্চি) দূরে থাকবে।

শুধু পুষ্ট সতেজ চারাই রোয়া ক'রবার জন্য বেছে নিতে হ'বে। কোনও কারণে চারা অতিরিক্ত লম্বা হয়ে গেলে লাগাবার সময়ে তার মাথাটা একটু ছেঁটে দিতে হ'বে। চারাগুলি মাটির ৩$\frac{3}{4}$ সেমি. (দেড় ইঞ্চি)-র বেশি নিচে যাবে না।

জমিতে চারা রোয়া করবার পরই একবার সেচ দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কোনও কোনও জায়গায় জমিতে সেচ দিয়ে পরে চারা লাগানো হয়।

২। জমিতে পেঁয়াজের কন্দ লাগানো ঃ

জমিতে সরাসরি পেঁয়াজের কন্দ লাগাবার আবার তিনটি নিয়ম চালু আছে।

প্রথম নিয়মে সমতল জমিতে ১৫ সেন্টিমিটার (৬ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে পেঁয়াজের কন্দ সরাসরি লাগান হয়। দ্বিতীয় নিয়মে ৪৫ সেন্টিমিটার (১৮ ইঞ্চি) চওড়া ভেলী বেঁধে তার উপর পেঁয়াজের কন্দ লাগানো হয়। তৃতীয় নিয়মে দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে নালী খুঁড়ে সেই নালীতে পেঁয়াজ লাগানো হয়।

এক একর জমিতে লাগাবার জন্য ৩০০ কেজি. থেকে ৩৫০ কেজি. পেঁয়াজের প্রয়োজন হয়। চারা রোয়া ক'রে যে পেঁয়াজের ফসল হয় শুধু তা থেকেই বীজের জন্য পেঁয়াজ বেছে নেওয়া ভাল। ছোট থেকে মাঝারি আকারের ভাল রকম পাকা, সুস্থ পেঁয়াজই বীজ হিসাবে ব্যবহার করা ভাল।

৩। জমিতে সরাসরি পেঁয়াজের বীজ লাগানো ঃ

এ নিয়মে ৩০ সেন্টিমিটার (১২ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে সরাসরি পেঁয়াজের বীজ বোনা হয়। বীজবোনা যন্ত্র দিয়েও লাগানো যায়।

এতে প্রতি একরে ৭ কেজি. থেকে ১৩ কেজি. পেঁয়াজের বীজ লাগে। বীজ বোনার পরই জমিতে সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

ছয় থেকে আট সপ্তাহ পরে প্রতি সারি থেকে কিছু কিছু চারা তুলে পাতলা করে দিতে হয় আর যেখানে যেখানে কম চারা বেরিয়েছে সেই ফাঁকে ফাঁকে চারা রোয়া ক'রে দেওয়া হয়।

সার প্রয়োগ ঃ

জৈব সার ছাড়া এক একর পেঁয়াজের জমির জন্য ৫০ কেজি. নাইট্রোজেন, ২৫ কেজি. ফসফরাস আর ৫০ কেজি. পটাসিয়াম প্রয়োগ করেই সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। ৫০ কেজি. নাইট্রোজেনের জন্য প্রয়োজন ২৫০ কেজি. এ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা ১১৫ কেজি. ইউরিয়া। ২৫ কেজি. ফসফরাসের জন্য প্রয়োজন ১৫০ কেজি. সুপার ফসফেট আর ৫০ কেজি. পটাসিয়ামের জন্য প্রয়োজন ১০০ কেজি. মিউরিয়েট অব পটাশ। অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন ঘটিত সার আর সমস্ত ফসফরাস এবং পটাশিয়াম ঘটিত সার জমিতে চারা লাগাবার আগে শেষ চাষ দেবার সময়ে জমিতে ছড়িয়ে মিশিয়ে দিতে হ'বে। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন ঘটিত সার চারা লাগাবার মাস খানেক পর চাপান সার হিসেবে দিতে হ'বে। এ সময়ে পেঁয়াজের চারা ৩০ সেমি. (১০ ইঞ্চি) মত উঁচু হবে। পেঁয়াজের দুই সারির মাঝখানে গাছের সারির দুই ইঞ্চি দূরে এই চাপান সার ছড়িয়ে দিয়ে ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হ'বে।

জমির পরিচর্যা ঃ

পেঁয়াজের ভাল ফলন পেতে হ'লে জমি থেকে সব সময়ে আগাছা পরিষ্কার ক'রে ফেলতে হ'বে। বিশেষ করে চারা রোয়া করবার পর প্রথম দিকে আগাছা দমন করবার দিকে বিশেষ নজর রাখতে হ'বে। আগাছা জন্মালে জমির সার আর জল খেয়ে নেবে; আর আগাছা বেশি বড় হ'লে পেঁয়াজের চারাগুলি রোদও পাবে না। আগাছা বড় হ'য়ে গেলে সেগুলো পরিষ্কার করবার সময়ে পেঁয়াজের

শেকড়ের ক্ষতি হ'তে পারে। এ অবস্থায় পেঁয়াজের আকার স্বাভাবিক হয় না অর্থাৎ বিকৃত আকারের কন্দ গঠনের সম্ভাবনা থাকে।

পেঁয়াজের শেকড় মাটির বেশি নীচে যায় না। তাই পেঁয়াজ লাগানো অবস্থায় জমিতে বেশি নীচে পর্যন্ত বিদা দিয়ে খুঁড়লে শেকড়ের ক্ষতি হ'তে পারে। সেজন্য, পেঁয়াজের সারির ফাঁকে ফাঁকে ছ'বার সাবধানে লম্বা হাতলওয়ালা হস্তবিদা নামক যন্ত্রের সাহায্যে মাটি অল্প খুঁড়ে দিতে হ'বে। এ ছাড়া আরও তিন থেকে চার বার হাত নিড়েনের দ্বারা আগাছা পরিষ্কার করা দরকার হয়।

জলসেচ ও জলনিকাশ ঃ

পেঁয়াজ চাষে ক'বার জলসেচ দিতে হ'বে তা নির্ভর করে পেঁয়াজ লাগাবার সময়, ঐ সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আর মাটির প্রকারের উপর। তাছাড়া, পেঁয়াজের চারা বা কন্দ কোন জিনিস বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হ'য়েছে তার উপরও জলসেচের তারতম্য হয়।

আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে পেঁয়াজের চাষ করলে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে মাঝে মাঝে জলসেচ দিলেই চলবে। আশ্বিন মাসের পর জমিতে পেঁয়াজের চারা বা বীজ লাগালে জলসেচ নিয়মিত দিতে হ'বে। মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকলে জলসেচের পরিমাণ বেশি লাগবে। আবার কাদার ভাগ বেশি থাকলে কম সেচেই চলবে। চারা লাগিয়ে পেঁয়াজের চাষ করলে চারা লাগানোর পরই অল্প সেচ দিতে হ'বে। তার তিন চার দিন পর আবার সেচ দেওয়া প্রয়োজন। এর পর থেকে সাধারণতঃ সাত দিন অন্তর জলসেচ দিতে হয়।

আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে পেঁয়াজের চারা লাগালে পাঁচ থেকে ছয় বার জলসেচ প্রয়োজন হয়। কার্তিক মাসে লাগানো ফসলে দিতে হয় বার থেকে পনেরো বার জলসেচ, আবার ফাল্গুন

মাসে পেঁয়াজের চারা লাগালে পনেরো থেকে বিশ বার জলসেচ প্রয়োজন হ'তে পারে। পেঁয়াজের পাতার ডগার দিকটা শুকোতে আরম্ভ করলে আর সেচ দেবার প্রয়োজন নেই। পেঁয়াজ তোলবার অন্ততঃ দিন সাতেক আগেই জলসেচ বন্ধ করা ভাল।

শুধু জলসেচ নয়, পেঁয়াজের জমিতে জলনিকাশের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হ'বে। পেঁয়াজের জমিতে জল দাঁড়ালে মাটির ভিতরকার বাতাস সরে যায় ; তাতে গাছের শেকড়ের শ্বাসকার্যের অসুবিধা হয়। ফলে গাছের জোর কমে যায় আর পেঁয়াজের কন্দ গঠনও ভালভাবে হয় না।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

কয়েক প্রকার ছত্রাকঘটিত রোগ পেঁয়াজের ফসলের ক্ষতি সাধন করে। তার মধ্যে ধসা রোগই প্রধান। এই রোগের আক্রমণ হ'লে কচি অবস্থায় পেঁয়াজের পাতায় কালো কালো দাগ দেখা যায়। আক্রমণ বেশি হ'লে পরে পাতাগুলি খসে পড়তে থাকে আর গাছ মরে যায়। আক্রমণ কম হ'লে গাছ বেঁচে যেতে পারে কিন্তু পেঁয়াজের কন্দগুলি ভালভাবে গঠিত হ'তে পারে না। ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান নামক ওষুধ ছিটিয়ে এই রোগের আক্রমণ দমন করা যায়। রোগ দেখা দেবার আগেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে জলে এই ওষুধ মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। তিন চার বার এই ওষুধ ছিটানো প্রয়োজন। প্রতি ২০০ লিটার জলে এক কেজি. ওষুধ মেশাতে হয়।

কোনও কোনও সময়ে এক রকমের চষি পোকা পেঁয়াজের ফসলের ক্ষতি করে। এ ছাড়া, এক প্রকার কাটুই পোকাও কচি অবস্থায় পেঁয়াজের পাতা খেয়ে নষ্ট করে। বি. এইচ. সি. নামক গুঁড়ো ওষুধ পাতায় ছড়িয়ে এই পোকার আক্রমণ দূর করা যায়। আক্রমণ বেশি হ'লে জলে গোলা ডি. ডি. টি. ব্যবহার করা যেতে

পারে। পাঁচশত গ্রাম ডি. ডি. টি. প্রতি ২০০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটাতে হ'বে, এ ছাড়া ডেমিক্রন, মেটাসিড, রোগোর অথবা মেলাথায়ন নামক তরল ওষুধ ব্যবহার করেও এই পোকার আক্রমণ দমন করা যায়। প্রতি তিন লিটার জলে এক মিলিলিটার ডেমিক্রন অথবা তুই মিলিলিটার মেটাসিড, অথবা তিন মিলিলিটার রোগোর অথবা পাঁচ মিলিলিটার মেলাথায়ন মিশিয়ে নিতে হ'বে। চারটে ওষুধের যে কোনও একটা ব্যবহার করলেই চলবে। এই ওষুধগুলির যে কোনও একটা জলে মিশিয়ে তু'সপ্তাহ অন্তর তিনবার স্প্রেয়ার যন্ত্রের যাহায্যে ছিটিয়ে দিলে পেঁয়াজের মাঠে কোনও পোকার আক্রমণ দেখা যাবে না।

পেঁয়াজ জমিতে লাগাবার আগে শেষ চাষ দেবার সময়ে একর প্রতি ১৫ কেজি. অলড্রিন নামক ওষুধ মিশিয়ে দিলে কাটুই পোকার আক্রমণ হয় না।

শস্য পর্যায় ঃ

রবিখন্দে পেঁয়াজের চাষ করা হয় সাধারণতঃ ধানের মাঠে ধান উঠে যাবার পর। চীনাবাদাম এবং বরবটীর পরও কোনও কোনও জায়গায় রবিখন্দে পেঁয়াজের চাষ হয়।

খরিফখন্দে পেঁয়াজের চাষ করা হয় সাধারণতঃ জোয়ার, লঙ্কা অথবা চীনাবাদামের পর।

আখ এবং কলার মাঠেও প্রধান ফসলের ফাঁকে ফাঁকে পেঁয়াজের চাষ করা যায়।

উত্তরপ্রদেশে জলদি জাতের ফুলকপি উঠিয়ে নিয়েও পেঁয়াজের চাষ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেও এভাবে পেঁয়াজের চাষ চলে। অনেক সময়ে চৈতালী ফসল হিসাবে শশা, ফুটি, ঝিঙ্গে এ সমস্ত সব্‌জির সাথে মিশ্র ফসল হিসেবেও পেঁয়াজের চাষ করা হয়।

পেঁয়াজ উঠানো ও ফলন ঃ

চারা রোপণের তিন থেকে পাঁচ মাস পর জমি থেকে পেঁয়াজ তোলবার উপযোগী হয়। কতদিন পর তুলতে হ'বে এটা প্রধানতঃ নির্ভর করে পেঁয়াজের জাত বা প্রকারের উপর। পেঁয়াজ তোলবার সময়ে গাছের সবুজ পাতাগুলো হ'লদে হ'তে থাকে এবং ক্রমে পাতার ডগার দিকটা শুকিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। হাত কোদালের সাহায্যে পেঁয়াজ তুলে নিয়ে ছায়ায় রাখতে হয়। অন্য গাছের পাতায় ঢেকে দু'চার দিন মাঠেও রাখা চলে।

পেঁয়াজের ফলন নির্ভর করে পেঁয়াজ লাগাবার সময় বা ঋতু, লাগাবার নিয়ম, পেঁয়াজের প্রকার এবং জমির প্রকারের উপর।

আমাদের দেশে একর প্রতি পেঁয়াজের গড় ফলন বড় জাতের পেঁয়াজের বেলায় ৩,৪০০ কেজি. আর ছোট জাতের পেঁয়াজের বেলায় ১,৭০০ কেজি.। শীতের মরসুমে উন্নত প্রথায় পেঁয়াজের চারা লাগিয়ে চাষ করলে একর প্রতি ১৩,০০০ কেজি. থেকে ১৮,০০০ কেজি. পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে। পেঁয়াজের কন্দ লাগিয়ে চাষ করলে এ থেকে শতকরা ২৫ ভাগ কম ফলন হ'তে দেখা যায়। বর্ষায় পেঁয়াজ লাগালে একর প্রতি ৩,৪০০ কেজি. থেকে ৪,৫০০ কেজি. পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। চৈতালী পেঁয়াজের ফলনও এরকমই হয়। কিন্তু এই পেঁয়াজ অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ ক'রে রাখা যায়।

পেঁয়াজের জাত বা প্রকার ঃ

পেঁয়াজের নানারকম জাত বা প্রকার দেখা যায়। এ সমস্ত জাতের আকার, গঠন, রঙ, সংরক্ষণ ক্ষমতা, পাকবার সময় এবং কন্দের ঝাঁঝালো ভাব নানারকম। সাধারণতঃ পেঁয়াজকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) বড় আকারের কন্দযুক্ত পেঁয়াজ যাদের ব্যাস পাঁচ থেকে দশ সেমি. পর্যন্ত হয়।

(২) ছোট আকারের পেঁয়াজ যার ব্যাস ১½ সেমি. থেকে ২½ সেমি. পর্যন্ত।

বড় আকারের পেঁয়াজের গন্ধ মৃদু, স্বাদ কিছু মিষ্টি আর এর ঝাঁঝ খুব কম। এদের মধ্যে তিন রকম রঙ দেখা যায়—লাল, রূপালী এবং হলদে। লাল জাতের পেঁয়াজের ঝাঁঝ একটু বেশি এবং এগুলি বেশিদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। হলদে জাতের পেঁয়াজের চাষ খুব কম হয়।

ছোট জাতের পেঁয়াজের ঝাঁঝ অনেক বেশি। আবার এর পুষ্টিমূল্যও কিছু বেশি। এ জাতের পেঁয়াজের আবার দু'রকম রঙ হয়—সাদা এবং লাল। লাল ছোট জাতের পেঁয়াজের চাষই বেশি।

পেঁয়াজের উন্নত জাতের মধ্যে পুসা রেড, প্রাইজ টেকার, মার্কেট গার্ডেনার, ইয়েলো গ্লোব, দি কুইন, হোয়াইট পাটনা, লার্জ রেড, পাটনা রেড, পুণা রেড, নাসিক রেড এর চাষ বেশি হয়।

বিদেশ থেকেও কয়েকটি উন্নত জাতের পেঁয়াজের আমদানী করা হ'য়েছে। এদের মধ্যে হোয়াইট পর্তুগাল, সিলভার স্কিন, অস্ট্রেলিয়ান ব্রাউন, রেড ইটালীয়ান এবং সুইট স্পেনিশ-এর নাম করা যেতে পারে।

বিভিন্ন জাতের পেঁয়াজের মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন সংকর জাতের পেঁয়াজ বের করবার জন্যে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে গবেষণা চলেছে। এ সমস্ত সংকর জাতের পেঁয়াজ উন্নত মানের হ'বে, এদের ফলনও বেশি হ'বে, আকার এবং গঠন হ'বে সুন্দর আর এগুলি বেশিদিন সংরক্ষণ করে রাখা চলবে। মহারাষ্ট্র কৃষিবিভাগ তিনটি খরিফখন্দের সংকর জাতের পেঁয়াজ আর পাঁচটি রবিখন্দের সংকর জাতের পেঁয়াজ বের করেছেন। খরিফখন্দের জাতগুলির নাম এন-৪০৪, এন-৪৯১ এবং এন-৫৩; এগুলি সবই লাল। রবিখন্দের সংকর জাতগুলির নাম দেওয়া হ'য়েছে এন-২-৪-১,

এন-২০৭-১, এন-৫-৮-২, এন-৫-৭-১ এবং এন-১২৩-৭-১। প্রথম তিনটি লাল জাতের এবং পরের দু'টি সাদা জাতের পেঁয়াজ।

পেঁয়াজ সংরক্ষণ:

পেঁয়াজ সংরক্ষণ করবার আগে ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে বেছে নিতে হ'বে। অপুষ্ট পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা চলবে না। ঘরের মেঝেতে বালি বিছিয়ে তার উপর ছড়িয়ে রেখে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যায়। কাঠের বা বাঁশের মাচা তৈরী ক'রে তাতে পেঁয়াজ ছড়িয়ে রাখাই ভাল। যে ঘরে পেঁয়াজ রাখা হ'বে তাতে বেশ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে পেঁয়াজগুলি নাড়াচাড়া করে উলটে পালটে দিতে হ'বে। আর ভেতরে পচা অথবা অঙ্কুরিত পেঁয়াজ থাকলে সরিয়ে ফেলতে হ'বে। এভাবে রাখলে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগের বেশি পেঁয়াজ নষ্ট হয় না। কিন্তু গুদামে অনেক পেঁয়াজ অঙ্কুরিত হ'য়ে যায়। পেঁয়াজ মাঠ থেকে তোলবার কয়েকদিন আগে 'মেলিক হাইড্রেজাইড' নামে ওষুধ জলে মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিলে কম পেঁয়াজ অঙ্কুরিত হয়।

ঠাণ্ডা ঘরে ৩২° ডিগ্রী. থেকে ৩৬° ডিগ্রী. ফারেনহিট তাপে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করাই সবচেয়ে ভাল।

পেঁয়াজ চাষে আয় ব্যয়ের হিসাব:

এক একর জমিতে উন্নত প্রথায় পেঁয়াজের চাষ করলে কত লাভ হ'তে পারে পর পৃষ্ঠায় তার আয় ব্যয়ের হিসাব দেখানো হ'ল।

প্রথমে বিভিন্ন খাতে একর প্রতি কি কি খরচ হ'বে তা দেখানো হ'চ্ছে।

চারার বাবদ খরচ ঃ

		টাকা
১। বীজের মূল্য— (৩ কেজি. প্রতি কেজি. ১০ টাকা হিসাবে)		৩০·০০
২। বীজতলায় চারা তোলবার খরচ—		৫০৫·০০
(ক) গোবর বা আবর্জনা পচা সার— (২৬ কু. ২৫ কেজি. প্রতি ৩৭½ কেজি. ২ টাকা হিসাবে)	১৪০·০০	
(খ) রাসায়নিক সার— (এমোনিয়াম সালফেট ৫ কেজি.)	৫·০০	
(গ) শ্রমিকের মজুরি—		
জমি তৈরী ও বীজতলা তৈরী—৩০ জন, চারার যত্ন নেওয়া— ৩০ জন	৩৬০·০০	
	৫০৫·০০	
মোট		৫৩৫·০০

মোট খরচ ঃ

১। চারার বাবদ মোট খরচ—	৫৩৫·০০
২। গোবর বা আবর্জনা সারের মূল্য— (৭৫ কু. প্রতি ৩৭½ কেজি: ২ টাকা হিসাবে)	৪০০·০০
৩। রাসায়নিক সারের মূল্য—	৪০০·০০
৪। ছত্রাক ও কীটনাশক ওষুধের মূল্য—	৭৫·০০
৫। জলসেচ দেবার জন্য দ্রব্যাদির মূল্য—	১০০·০০
৬। বিভন্ন খাতে শ্রমিকের মজুরি ১১০টি—	৬৬০·০০

	(শ্রমিকের সংখ্যা)
(১) লাঙ্গল চালানো ও জমি তৈরী—	২০
(২) আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করা—	৩
(৩) জমিতে গোবর ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও মেশানো—	৫

		(শ্রমিকের সংখ্যা)
(৪)	চারা রোপণ—	১২
(৫)	প্রথমবার নিড়েন দেওয়া ও চাপান সার দেওয়া—	১০
(৬)	পরের নিড়েন দেওয়া—	২০
(৭)	জল সেচ (৬ বার)—	১২
(৮)	ওষুধ প্রয়োগ—	৮
(৯)	পেঁয়াজ তোলা ও গুদামে নেওয়া—	২০
		১১০

মোট খরচ—২১৭০·০০

অর্থাৎ, প্রায় ২,২০০ টাকা

এক একর পেঁয়াজের চাষে ২,২০০ টাকা খরচ করলে কমপক্ষে ৫০০০ কেজি. পেঁয়াজ পাওয়া যাবে। প্রতি কিলোগ্রামের দাম এক টাকা ক'রে হ'লে মোট আয় হ'বে ৫০০০ টাকা। অর্থাৎ এক একর জমিতে পেঁয়াজের চাষ করলে নীট লাভ হ'বে (৫০০০ – ২,২০০) টাকা অর্থাৎ ২,৮০০ (দু' হাজার আটশ') টাকা।

আদা

মাটির নীচের কাণ্ডের জন্যেই আদার চাষ করা হ'য়ে থাকে। এই কাণ্ড আমাদের দেশে মসলা হিসাবে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু আদার প্রধান গুণ ওষুধ হিসেবে এর উপকারিতা। রান্নায় আদার ব্যবহার ছাড়াও অনেক ওষুধ তৈরী করতে আদার প্রয়োজন হয়। শুধু মানুষের নয় গরু এবং অন্যান্য পশুরও পেটের দূষিত গ্যাস দূর করতে যত ওষুধ তৈরী হয় তার জন্যেও আদা একান্ত আবশ্যক। আমাদের রান্নাতেও আদা ব্যবহার করলে হজমের সুবিধা হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। আদার গুণের শেষ নেই। আমাদের জ্বর

হ'লে সকালে ঘুম থেকে উঠে আদা নুন খেলে মুখে স্বাদ আসে। সর্দিতে তেল মুড়ি আদা অতি উপাদেয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে আদার চাষ শুরু হ'য়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে শীত খুব বেশি নয় সেখানেই ব্যাপকভাবে আদার চাষ হ'য়ে থাকে। দক্ষিণ এশিয়াই আদার আদি জন্মস্থান বলে বলা হয়। ভারতবর্ষ, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জামাইকা, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকাতেই আদার চাষ সবচেয়ে বেশি হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই আদার চাষ রয়েছে। প্রতি বছর আমাদের দেশ থেকে অনেক টাকার আদা বিদেশে পাঠানো হয়। সমুদ্র সমতল থেকে আরম্ভ করে তিন হাজার ফুট উঁচু জায়গা পর্যন্ত সমস্ত স্থানেই আদার চাষ হয়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

যেখানে তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত বেশ বেশি সেখানেই আদা ভাল জন্মায়। কিছুটা ছায়াযুক্ত জায়গাই আদার চাষের পক্ষে উপযোগী।

জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত উঁচু, দোঁয়াশ মাটি আদার চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকা প্রয়োজন। জলসেচের সুবিধা থাকলে বেলে দোঁয়াশ, লাল মাটি এবং ল্যাটেরাইট মাটিতেও আদার চাষ করা যেতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করে মহারাষ্ট্রের কালো কাদাযুক্ত মাটিতেও আদার চাষ করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু আদার জমিতে জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক।

বীজ নির্বাচন ও বপনের সময় ঃ

আদার মাটির নীচেকার কাণ্ড যা আমরা খেয়ে থাকি তা কেটে কেটেই আদার চাষ হ'য়ে থাকে। সুস্থ, ভালরকম পাকা, নীরোগ আদা থেকেই আদার বীজ বেছে নিতে হ'বে। প্রতিটি কাটা অংশে

দু'টি কুঁড়ি থাকা আবশ্যক। প্রতি একরের জন্য ৩৫০ কেজি. থেকে ৭৫০ কেজি. আদার বীজ প্রয়োজন হয়।

উত্তর ভারতে এপ্রিল মাস থেকেই আদা লাগানো আরম্ভ হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আর একটু দেরী ক'রে মে অথবা জুন মাসে আদা জমিতে লাগানো হয়।

জমি তৈরী ঃ

আগেকার ফসল জমি থেকে তুলে নেবার পরেই আদার জমি একবার চাষ দিয়ে ফেলে রেখে রোদ খাওয়াতে হয়। তারপর আদা লাগাবার আগে অন্ততঃ পাঁচ থেকে ছয় বার ভাল করে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা প্রয়োজন। শেষ চাষ দেবার সময়ে একর প্রতি ৩৭ কু. ৫০ কেজি. মত গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমিতে ছড়িয়ে দিতে হ'বে।

জমিতে আদা লাগাবার নিয়ম ঃ

আদার জমি চাষ দিয়ে তৈরী হ'বার পর সমস্ত জমিটাকে ছোট ছোট প্লটে বা খণ্ডে ভাগ করতে হয়। প্রতিটি খণ্ড ৯০ সেমি. লম্বা এবং ৪৫ সেমি. চওড়া করে তৈরী করতে হবে। ৪৫ সেমি. লম্বা এবং ৪৫ সেমি. চওড়া খণ্ডও করা যেতে পারে। প্রতিটি প্লট বা খণ্ড জমির সমতল থেকে ৩৭·৫ সেমি. থেকে ৪৫ সেমি. উঁচু থাকবে। আর প্রতিটি খণ্ডের চারদিকে থাকবে জল নিকাশের জন্য নালী। প্রতিটি নালী ২২·৫ সেন্টিমিটার থেকে ৩০ সেন্টিমিটার (৯ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি) চওড়া আর ৪৫ সেন্টিমিটার থেকে ৬০ সেন্টিমিটার (১৮ ইঞ্চি থেকে ২৪ ইঞ্চি) গভীর থাকবে।

ছোট ছোট খণ্ড আর চারদিকের নালী তৈরী হ'বার পর খণ্ডগুলির মধ্যে ৫ সেমি. (২ ইঞ্চি) গভীর ছোট ছোট নালী তৈরী করতে হয়। এই নালীগুলির একটি আর একটি থেকে ২২·৫ সেন্টিমিটার (৯ ইঞ্চি) দূরে রাখাই ভাল। প্রতিটি ছোট নালীতে ১৫ সেন্টি-

মিটার (৬ ইঞ্চি) দূরে দূরে ৫ সেমি. (২ ইঞ্চি) গভীরে কাটা আদার টুকরোগুলি লাগাতে হয়। তারপর শুকনো পাতা দিয়ে পনেরো বিশ দিন ঢেকে রাখা ভাল। আদার গাছে ছায়া দেবার জন্যে দক্ষিণ ভারতে নালীগুলিতে রেড়ি অথবা অড়হর গাছ লাগানো হয়।

জমিতে সার প্রয়োগ ঃ

জৈব সার ছাড়া আদার জমিতে কিছু পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আদা জমিতে লাগাবার আগে একর প্রতি ৪০ কেজি. ফসফরাসযুক্ত সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তারপর লাগাবার একমাস পরে একবার, আবার দু'মাস পরে একবার অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন সার এমোনিয়াম সালফেট আকারে দেওয়া যেতে পারে। একর প্রতি মোট ৪০ কেজি. নাইট্রোজেনই যথেষ্ট। পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সারের সাথে মিশিয়ে এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা ভাল। ২০০ কেজি. এমোনিয়াম সালফেট থেকে ৪০ কেজি. নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে। আর ৪০ কেজি. ফসফরাসের জন্য প্রয়োজন ২৫০ কেজি. সুপার ফসফেট।

জলসেচ ঃ

যদি বৃষ্টি হ'বার সম্ভাবনা না থাকে জমিতে আদা লাগাবার আগে একবার জলসেচ দিতে হয়। তারপর প্রয়োজন হ'লে চার থেকে দশ দিন অন্তর আট দশ বার জলসেচ দিতে হয়। অবশ্য বর্ষা নেমে গেলে অনেক সময়েই আদায় বেশি জলসেচ দেবার প্রয়োজন হয় না। আদা সাধারণতঃ বর্ষাকালের ফসল। তাই ঠিক ক'দিন পর পর জলসেচ দিতে হ'বে স্থির করে বলা যায় না। মোট কথা দশ বার দিন পর পর অবশ্য জমিতে জল দিতে হ'বে। সেই জল বৃষ্টি থেকেই আসুক আর সেচ থেকেই আসুক।

জমির পরিচর্যা ঃ

আদার জমিতে ঘাস বা আগাছা দেখা দিলেই নিড়েন দিতে হ'বে। এ ব্যাপারে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলা মুশ্‌কিল। তবে সাধারণতঃ তিন চার বার নিড়েন দেওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রতি বার নিড়েন দেবার পর আদার সারির পাশে শুকনো পাতা ছড়িয়ে দেওয়া ভাল।

জমিতে আদা লাগাবার দশ থেকে কুড়ি দিন পরই মাটির উপর আদার কাণ্ড বেরিয়ে আসে। তার কদিন পর অর্থাৎ লাগাবার ত্রিশ থেকে চল্লিশ দিন পর একবার প্রতিটি আদার সারির দু'পাশে মাটি তুলে ভেলী বেঁধে দিতে হয়। প্রথমবার ভেলী বাঁধবার কুড়ি থেকে ত্রিশ দিন পর দ্বিতীয় বার ভেলী বেঁধে দেবার প্রয়োজন হ'তে পারে।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

সাধারণতঃ আদার গাছে কোনও রোগ বা পোকার উৎপাত দেখা যায় না। তাই তার প্রতিকারের জন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রয়োজন হয় না। জলনিকাশ ভালভাবে না হ'লে এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে আদা পচে যায়।

শস্য পর্যায় ঃ

আদার ফসল কাটতে নয় থেকে দশ মাস লাগে। তাই আদা বছরের একমাত্র ফসল। অনেক সময়েই কিছু আদা তুলে বাকীটা দ্বিতীয় বছরের ফসলের জন্য মাঠেই রেখে দেওয়া হয়। কখনও কখনও কলা বাগানের মধ্যে কলার সারির ফাঁকে ফাঁকেও আদার চাষ হয়। আদার সাথে পর্যায়ক্রমে একই জমিতে পরের বছরগুলিতে হলুদ, ভুট্টা, লঙ্কা, পেঁয়াজ অথবা রসুনের চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া কখনও কখনও আদার জমি থেকে আদা তুলে পরের বছর কচু, মিষ্টি আলু অথবা আউশ ধানও লাগানো হ'য়ে থাকে।

তামিলনাড়ু এলাকায় নারকেল, কফি এবং কমলালেবুর বাগানেও প্রধান ফসলের সারির ফাঁকে ফাঁকে আদা লাগানো হ'য়ে থাকে।

ফসল তোলা ও ফলন :

কার্ত্তিক-অঘ্রাণ মাস থেকেই আদার গাছ শুকোতে আরম্ভ করে। তখন থেকেই আদা তোলা শুরু হয়। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়েই জমি থেকে আদা তোলা হয়।

আদার ফলন আবহাওয়ার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সাধারণতঃ একর প্রতি ২,৫০০ কেজি. থেকে ৫,০০০ কেজি. পর্যন্ত আদার ফলন হয়।

আদার জাত বা প্রকার :

আদার একটি মাত্র জাতই চাষ করা হ'য়ে থাকে। আম আদা নামে এক প্রকারের আদা দেখা যায়। কিন্তু এটা আদা নয়; আম আদা আসলে এক প্রকার হলুদ।

আদা সংরক্ষণ :

বিদেশে পাঠাবার জন্য আদা সংরক্ষণের আগে বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া আবশ্যক। এই প্রক্রিয়াটি বিস্তারিত ভাবে নীচে লেখা হ'ল।

১। আদা জমি থেকে তুলে প্রথমে রোদে শুকিয়ে নিতে হ'বে।

২। তারপর আদার গায়ের মাটি ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে একরাত জলে ভিজিয়ে রাখা দরকার।

৩। একরাত জলে ভিজিয়ে রাখবার পর আদার উপরের খোসা সাবধানে ছাড়িয়ে নিতে হয়।

৪। তারপর খোসা ছাড়ানো আদা ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে তিন চার দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হ'বে।

৫। রোদে শুকোবার পর আবার তু'ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে শুকিয়ে নিতে হ'বে।

৬। তারপর ছেঁড়া চটের টুকরো দিয়ে আদাগুলোকে ঘসে তার উপরের খোসা একদম সরিয়ে ফেলতে হ'বে।

৭। খোসা ছাড়ানো আদা ঘন চুনের জলে কয়েক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হ'বে।

৮। তারপর আদাগুলোতে ১২ ঘণ্টা গন্ধকের ধোঁয়া দিতে হ'বে।

৯। শেষে তিন চার দিন আদাগুলোকে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

আদা বেশি দিন রাখতে হ'লে ঘরের মেঝেতে শুকনো বালি বিছিয়ে ছড়িয়ে রাখতে হয়। কাঠের বা বাঁশের মাচা তৈরী করেও আদা ছড়িয়ে রাখা যায়।

হলুদ

মসলা হিসেবে হলুদের ব্যবহার শুধু ভারতবর্ষে নয় এশিয়ার সমস্ত দেশেই রয়েছে। হলুদ আমাদের সব তরকারীতেই দিতে হয়। হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠানে হলুদ শুভ সূচনা করে। ওষুধ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে। হলুদের মাটির নীচেকার শুকনো কন্দই আমরা মসলা হিসেবে খেয়ে থাকি। এমনিতে কচি অবস্থায় কাঁচা হলুদ খাওয়াও শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী।

ভারতবর্ষ ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন, চীন, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও হলুদের চাষ হ'য়ে থাকে। ভারতবর্ষের সমুদ্র সমতল থেকে আরম্ভ করে ১·২ কিমি. (৪,০০০ ফুট) পর্যন্ত উঁচু পাহাড়ে এলাকাতেও হলুদের চাষ হ'য়ে থাকে। বুনো হলুদ এর চাইতে উঁচুতেও দেখা যায়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

আদার মত যেখানে তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত বেশ বেশি সেখানেই হলুদ ভাল জন্মায়। তেমনি কিছুটা ছায়াযুক্ত জায়গাই হলুদ চাষের পক্ষে ভাল।

জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত উঁচু, বেলে দোঁয়াশ মাটিতেই হলুদ সবচেয়ে ভাল হয়। যে কোনও জমিতেই হলুদের চাষ হ'তে পারে। তবে কাদার ভাগ বেশি থাকলে জল নিকাশের অসুবিধা হয় বলে বেশি কাদাযুক্ত মাটিতে হলুদের চাষ না করাই ভাল।

ক্ষারযুক্ত মাটিতে হলুদের চাষ করা যায় না।

বীজ নির্বাচন ঃ

হলুদের মাটির নীচেকার অংশ যা আমরা খেয়ে থাকি তা কেটে কেটেই হলুদের চাষ হ'য়ে থাকে। বীজের জন্য ভালরকম পাকা হলুদ বেছে নিতে হ'বে। প্রতিটি কাটা অংশে দু'টি কুঁড়ি থাকা আবশ্যক। দু'বছরের পুরানো হলুদের গাছ থেকেই সাধারণতঃ বীজের জন্য হলুদ রাখা হয়। গোবরের সাথে কিছুটা জল মিশিয়ে কাই তৈরী করে সেই কাই বীজ হলুদের গায়ে মাখিয়ে জমিতে লাগানো হয়। এক একর জমিতে লাগাবার জন্য ৭৫০ কেজি. হলুদের বীজ প্রয়োজন।

জমি তৈরী ঃ

হলুদের জমি তৈরী করতে পাঁচ ছ'বার লাঙ্গল দিতে হ'বে। পুকুরের কাদা জমিতে দিলে হলুদ ভাল হয়। চাষ হ'বার পর সমস্ত জমিটাকে, ৫৪০ সেমি. (১৮ ফুট) লম্বা আর ৩৬০ সেমি. (১২ ফুট) চওড়া ছোট ছোট প্লট বা খণ্ডে ভাগ করা হয়। প্রতি খণ্ডের চারদিকে জল নিকাশের জন্য নালী রাখা আবশ্যক।

বপনের সময় ও নিয়ম ঃ

বৈশাখ মাস থেকে আষাঢ় মাসের মধ্যেই জমিতে হলুদ লাগানো ভাল।

সাধারণতঃ অন্য ফসলের সহিত মিশ্র ফসল হিসাবেই হলুদের চাষ করা হয়। কোথাও কোথাও আলের ধারে জলসেচের নালীর কাছেও হলুদ লাগানো হয়। হলুদ ছায়ায় ভাল জন্মায়। পেঁপে বাগান ও কলা বাগানের মধ্যেও গাছের ফাঁকে ফাঁকে হলুদের চাষ করা হয়। আদা, কচু, ওলের সাথে মিশ্র ফসল হিসাবেও অনেক জায়গায় হলুদ লাগানো হয়। সমতল জমিতে ৩০ সেমি. (এক ফুট) দূরে দূরে সারিতে হলুদ বসানো হয়। প্রতি সারিতে ২২ সেমি. (নয় ইঞ্চি) দূরে দূরে এক একটি হলুদের বীচন লাগাতে হ'বে। মাটির সমতল থেকে দুই ইঞ্চি নীচে কন্দটি থাকবে। তারপর উপরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে।

হলুদ আলাদা মাঠে লাগানো হ'লে হলুদের সারির ফাঁকে ফাঁকে মূলা, পালং এসবও লাগানো যায়।

সার প্রয়োগ ঃ

জৈব সার ছাড়া হলুদের জমিতে কিছু পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। হলুদ জমিতে লাগাবার আগে একর প্রতি ৪০ কেজি. ফসফরাসযুক্ত সার দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়, তারপর বীজ লাগাবার একমাস পর একর প্রতি ২০ কেজি. নাইট্রোজেন আর দু'মাস পর আরও ২০ কেজি. নাইট্রোজেন দিতে হ'বে।

জলসেচ ঃ

বর্ষা নেমে গেলে অনেক সময়েই হলুদে বেশি জলসেচ দেবার প্রয়োজন হয় না। লাগাবার পর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা না থাকলে একবার হলুদের জমিতে জল দিতে হ'বে। তারপরও আকাশের অবস্থা বুঝেই জলসেচ দিতে হ'বে। আট দশ দিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি না হ'লেই সেচ প্রয়োজন।

পরিচর্যা ঃ

হলুদের জমিতে আগাছা দেখা দিলেই নিড়েন দিতে হ'বে। সাধারণতঃ তিন চার বার নিড়েন দেওয়া প্রয়োজন হয়। হলুদ লাগাবার মাসখানেক পরই গাছ বেশ বড় হ'য়ে মাঠ ঢেকে ফেলে। সে সময়ে একবার ভাল ক'রে নিড়েন দিয়ে হলুদের সারির ছু'পাশে মাটি তুলে ভেলী বেঁধে দিতে হ'বে। মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকলে প্রথমবারের মাটি অনেক সময়ে বৃষ্টির জলে বসে যায়। সে অবস্থায় প্রথমবার মাটি দেবার একমাস পরে আবার ভেলী বেঁধে দেবার প্রয়োজন হ'তে পারে।

রোগ ও কীট শত্রুর প্রতিকার ঃ

হলুদের জমিতে সাধারণতঃ কোনও রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে এক রকমের কাটুই পোকা হলুদের পাতার গোড়ার দিকটা কেটে নষ্ট করে। গাছ কচি অবস্থাতেই এই পোকা দেখা দেয়। এই পোকার আক্রমণ দেখা গেলে ডি. ডি. টি. গুঁড়ো জলের সাথে মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। প্রতি ছুইশত লিটার জলে পাঁচশত গ্রাম ডি. ডি. টি. গুঁড়ো মিশিয়ে ছিটাতে হ'বে।

সাধারণতঃ পৌষ মাসের হলুদ গাছের আর নতুন পাতা হয় না। ফাল্গুন মাস থেকেই গাছের পাতাগুলি সব হ'লদে হ'তে আরম্ভ করে। চৈত্র মাসেই সাধারণতঃ হলুদ মাঠ থেকে তোলা হয়। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়েই এই ফসল তোলা হয়। এক একর জমি থেকে গড়ে ১,৫০০ কেজি. থেকে ১,৮০০ কেজি. পর্যন্ত হলুদ পাওয়া যায়। ঠিকমত সার এবং জলসেচ দিলে আর পরিচর্যা করলে এর ফলন একর প্রতি ৩,৫০০ কেজি. পর্যন্ত হ'তে পারে।

হলুদের জাত ঃ

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 'পাটনাই' জাতের হলুদের কদর বেশি। মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ মঞ্জল' আর কর্ণাটকে 'মুনভাগা' 'বালাগা' এবং 'ইয়েনচাগা' জাতের হলুদের চাষ বেশি হয়।

রসুন

মসলা হিসাবে ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই রসুনের চাষ আছে। প্রতি বছর আমাদের দেশ থেকে অনেক রসুন বিদেশে পাঠানো হয় আর তাতে দেশে অনেক টাকা আসে। রসুনের খাদ্যমূল্যও পেঁয়াজের থেকে অনেক বেশি। এ থেকে অনেক ওষুধ তৈরী করা হয়। একটি রসুনের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট কন্দ থাকে। রোজ সকালে খালিপেটে একটি কাঁচা রসুনের কোয়া বা কন্দ খেলে অনেক রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

এশিয়ার মধ্যভাগই রসুনের জন্মস্থান।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

যেখানে গরমও বেশি নয়, আবার শীতও বেশি নয়, সেখানেই রসুনের চাষ ভাল হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শীতকালেই রসুনের চাষ হয়। সমুদ্র সমতল থেকে উঁচু পাহাড়ে অঞ্চলে যেখানে তাপমাত্রা ৫০° ডিগ্রী ফারেনহিটের নীচে যায় না সেখানেই রসুনের চাষ হ'তে পারে। কিন্তু রসুনের চাষের সময়ে বেশি বৃষ্টি হ'লে গাছ মরে যাবে। তাই পাহাড়ে এলাকার মধ্যে যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানেই রসুনের চাষ হ'তে পারে।

পেঁয়াজের মত রসুনও দোঁয়াশ মাটিতেই ভাল হয়। তবে রসুন চাষের জন্য আর একটু বেশি উর্বর মাটি প্রয়োজন। অতিরিক্ত অম্ল

অথবা ক্ষার জমিতে রসুনের চাষ করা চলবে না। রসুন চাষের জন্য এ রকম জমি বেছে নিতে হ'বে যার অম্লতা-ক্ষারত্বের পরিমাপ বা পি. এইচ. ৫·৬ থেকে ৬·৫ এর মধ্যে থাকে। ৬ এর উপর পি. এইচ. হ'লেই ভাল। মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকলে তার উর্বরতা শক্তি কমে যায় তাই সেরকম মাটিতে রসুনের ফলন ভাল হয় না।

বীজ নির্বাচন ও বপনের সময়ঃ

রসুনের ছোট ছোট কন্দ লাগিয়েই রসুনের চাষ করা হয়। সুস্থ, নীরোগ এবং খুব ভালভাবে পাকা রসুনই বীজের জন্য বেছে নিতে হ'বে। এক একর জমির জন্য ১৫০ কেজি. থেকে ২০০ কেজি. রসুন লাগে।

পাহাড়ে এলাকায় রসুন চৈত্র-বৈশাখ থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বোনা হয়। উত্তর ভারতে বর্ষা শেষ হ'বার সাথে সাথে ভাদ্র-আশ্বিন এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসে রসুনের বীজ বোনা হয়। জলদি জাতের আমন কাটবার পর সেই জমিতে অঘ্রাণের প্রথম দিকেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে রসুন লাগানো হয়। দক্ষিণ ভারতে শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে কার্ত্তিক-অঘ্রাণ পর্যন্ত রসুন লাগাবার সময়।

জমি তৈরীঃ

চার পাঁচবার লাঙ্গল দিয়ে রসুনের জমিটাকে বেশ ভাল ক'রে তৈরী করে নিতে হ'বে। খুব বেশি গভীর করে লাঙ্গল দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ, রসুনের মূল মাটির উপর থেকে সাত থেকে দশ সেমি.-র (তিন চার ইঞ্চি) বেশি নীচে যায় না। প্রথম চাষ দেবার পর একর প্রতি ৫৬·২৫ কু. থেকে ৭৫ কু. (১৫০ মণ থেকে ২০০ মণ) পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমিতে ছড়িয়ে দিতে হ'বে যাতে সারটা ভালভাবে জমির সাথে মিশে যেতে পারে। শেষ চাষ দেবার সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার জমিতে মিশিয়ে দিতে হ'বে।

সার প্রয়োগ :

জৈব সার ছাড়া একর প্রতি ৫০ কেজি. নাইট্রোজেন, ২৫ কেজি. ফসফরাস এবং ৫০ কেজি. পটাশিয়াম প্রয়োগ করলে রসুনের ফলন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। ৫০ কেজি. নাইট্রোজেনের জন্য প্রয়োজন ২৫০ কেজি. এমোনিয়াম সালফেট অথবা ১১৫ কেজি. ইউরিয়া সার। ২৫ কেজি. ফসফরাস এর জন্য প্রয়োজন ১৫০ কেজি. সুপার ফসফেট আর ৫০ কেজি. পটাশিয়ামের এর জন্য দরকার ১০০ কেজি. মিউরিয়েট অব পটাশ। অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন জাতীয় সার আর সমস্ত ফসফরাস এবং পটাশিয়াম জাতীয় সার জমিতে রসুনের কোয়া লাগাবার আগে অথবা শেষ চাষ দেবার সময়ে জমিতে ছড়িয়ে মিশিয়ে দিতে হ'বে। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন জাতীয় সার বীজ বোনার মাসখানেক পর চাপান সার হিসেবে দিতে হ'বে। এ সময়ে রসুনের চারা ১৫ সেমি. (ছয় ইঞ্চি) মত উঁচু হ'বে। রসুনের দুই সারির মাঝখানে গাছের লাইনের ৫ সেমি. (দুই ইঞ্চি) দূরে এই চাপান সার ছড়িয়ে দিয়ে ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হ'বে।

বীজ বপনের নিয়ম :

সমতল জমিতে ১৫ সেন্টিমিটার (৬ঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে রসুনের ছোট কন্দ বসাতে হয়। প্রতি সারিতে প্রায় ৮ সেমি. (৩ ইঞ্চি) দূরে দূরে এক একটি ছোট কন্দ থাকবে। প্রথমে ১৫ সেমি. (ছয় ইঞ্চি) দূরে দূরে ১০ সেমি. (চার ইঞ্চি) গভীর ছোট ছোট নালী তৈরী করে তাতে রাসায়নিক সার মিশিয়ে নিয়ে মাটির সমতলের ৫ সেমি. (দুই ইঞ্চি) নীচে রসুনের ছোট কন্দগুলি বসাতে হ'য়। তারপর মাটি দিয়ে কন্দগুলি ঢেকে দিতে হ'বে।

জলসেচ ও জল নিকাশ :

রসুনের কন্দ জমিতে লাগাবার দু'চার দিন আগেই একবার সেচ

দিয়ে জমিতে জো এনে পরে রসুনের ছোট কন্দ লাগাতে হয়। এ অবস্থায় লাগাবার চার পাঁচ দিন পর একবার অল্প জল সেচ দিতে হ'বে। তারপর রসুনের চারাগুলি মাটির উপর বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তিন দিন অন্তর অল্প জল ছিটিয়ে দিতে হয়। চারাগুলি মাটির উপর বেরিয়ে আসার পর সাতদিন থেকে দশদিন পর পর আট থেকে দশবার রসুনে সেচ দিলে ভাল। এর মাঝে যদি বৃষ্টি হয় তা'হলে অনেক কম সেচ দিলেই চলবে।

শুধু জল সেচ নয়, রসুনের জমিতে জলনিকাশের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হ'বে। তাই কখনও বেশি জল একবারে রসুনের জমিতে দেওয়া চলবে না।

জমির পরিচর্যা ঃ

অন্যান্য মাটির তলার ফসলের মত রসুনের জমিও সব সময়ে আগাছা মুক্ত রাখতে হ'বে। বিশেষ করে প্রথম দিকে আগাছা দমন করবার উপর বিশেষ নজর রাখতে হ'বে।

পেঁয়াজের মত রসুনের শেকড়ও মাটির বেশি নীচে যায় না। তাই রসুনের জমিও বেশি নীচে পর্যন্ত বিদা দিয়ে খুঁড়লে শেকড়ের ক্ষতি হ'তে পারে। রসুনের লাইনের ফাঁকে ফাঁকে দু'বার সাবধানে লম্বা হাতলওয়ালা হস্তবিদা নামক যন্ত্রের সাহায্যে মাটি অল্প খুঁড়ে দিতে হ'বে। এ ছাড়া আরও তিন চার বার হাত নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা দরকার।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

কয়েক রকমের ছত্রাকের আক্রমণে রসুনের ক্ষতি হয়। এদের মধ্যে এক প্রকার ছত্রাক ধসা রোগ সৃষ্টি করে। এ রোগই মাঠে বেশি দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণ হ'লে কচি অবস্থায় রসুনের পাতায় কালো কালো দাগ দেখা যায়। আক্রমণ বেশি হ'লে পরে পাতাগুলি খসে পড়তে থাকে আর ক্রমে ক্রমে গাছ মরে যায়।

আক্রমণ বেশি না হ'লে গাছ বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু রসুনের কন্দগুলি ভালভাবে গঠিত হ'তে পারে না।

ব্লাইটকস বা ফাইটোলান নামক ওষুধ ছিটিয়ে রসুনের ধসা রোগের আক্রমণ দমন করা যায়। রোগ দেখা দেবার আগেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে জলে এই ওষুধ মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। তিন চার বার ওষুধ ছিটানো প্রয়োজন। প্রতি দুইশত লিটার জলে এক কেজি. ওষুধ মেশাতে হ'বে।

কখনও কখনও এক প্রকারের চোষি পোকা রসুনের ফসলের ক্ষতি করে। এক রকমের কাটুই পোকাও মাঝে মাঝে কচি অবস্থায় রসুনের পাতা কেটে নষ্ট করে। বি. এইচ. সি. নামক গুঁড়ো ওষুধ ছড়িয়ে এই দু'রকম পোকার আক্রমণই দূর করা যায়। আক্রমণ বেশি দেখা গেলে জলে গোলা ডি. ডি. টি. গুঁড়ো ব্যবহার করা যেতে পারে। দুইশত লিটার জলে পাঁচশত গ্রাম ডি. ডি. টি. গুঁড়ো মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটাতে হ'বে। এ ছাড়া ডেমিক্রন, মেটাসিড, রোগোর অথবা মেলাথায়ন নামক ওষুধ ব্যবহার করেও এ সমস্ত পোকার আক্রমণ দমন করা যায়। কতটা জলে কতটা ওষুধ মেশাতে হ'বে তা পেঁয়াজের চাষের জায়গায় লেখা হ'য়েছে।

রসুন জমিতে লাগাবার আগে শেষ চাষ দেবার সময়ে একর প্রতি ১৫ কেজি. অলড্রিন নামক ওষুধ মিশিয়ে দিলে কাটুই পোকার আক্রমণ হ'বে না।

রসুনের জমির জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকলেও অনেক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ফসল তোলা ও ফলন:

রসুন গাছের ডগার দিকটা হলদে থেকে বাদামী রঙের হ'লেই রসুন তোলবার সময় হয়। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে রসুন জমি

থেকে তোলা হয়। রসুনগুলো পরিষ্কার ক'রে ছায়ায় শুকিয়ে ঘরে তুলতে হ'বে।

এক একর জমি থেকে ২,০০০ কেজি. থেকে ৪,০০০ কেজি. পর্যন্ত রসুন পাওয়া যায়।

রসুনের জাত বা প্রকার ঃ

দেশী রসুনের বিশেষ কোন জাত বা প্রকার নেই। বিদেশী রসুনের জাতের মধ্যে 'ক্রেয়োল', 'ইতালিয়ান' এবং 'তাহিটি'র নাম করা যেতে পারে।

রসুন সংরক্ষণ ঃ

খুব ভাল রকম পাকা, সুস্থ গাছের রসুনই সংরক্ষণ করা চলে। প্রথমে রসুনগুলি ভাল করে শুকিয়ে বেছে নিতে হ'বে। ঘরের মেঝেতে বালি বিছিয়ে তার উপর ছড়িয়ে রেখে রসুন সংরক্ষণ করা যায়। কাঠের বা বাঁশের মাচা তৈরী করে তাতে রসুন ছড়িয়ে রাখাই ভাল। যে ঘরে রসুন রাখা হ'বে তাতে বেশ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে রসুনগুলি নাড়াচাড়া করে উল্‌টে পাল্‌টে দিতে হ'বে। তার ভেতরে পচা অথবা অঙ্কুরিত রসুন থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে। এভাবে রাখলে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগের বেশি রসুন নষ্ট হয় না।

ঠাণ্ডা ঘরে ৩২° ডিগ্রী থেকে ৩৬° ডিগ্রী ফারেনহিট তাপে রসুন সংরক্ষণ করাই সবচেয়ে ভাল।

খাম আলু

ভারতবর্ষের কোনও কোনও জায়গায় খাম আলু নামে এক রকম মাটির তলার ফসলের চাষ দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বাড়ীর আশেপাশে, পুকুরের ধারে খাম আলু

লাগানো হয়। উড়িষ্যা, আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও এর বেশ চাষ হয়।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ

যেখানে বৃষ্টিপাত বেশ বেশি এবং আবহাওয়া বেশ গরম থাকে সেখানেই খাম আলুর চাষ হয়।

বেলে দোঁয়াশ মাটিতেই খাম আলু সব চেয়ে ভাল জন্মায়। এর চাষের জন্য বেশী উর্বর মাটির প্রয়োজন হয় না। কিছুটা অম্লযুক্ত মাটিই খাম আলুর চাষের পক্ষে ভাল। তবে খাম আলু চাষের জন্য উঁচু জায়গা যেখানে একটুও জল না দাঁড়ায় সে রকম জমি বেছে নিতে হবে।

জমি তৈরী ঃ

সাধারণতঃ বাড়ীর আশে পাশে বা পুকুরের ধারে, বাগানের বেড়ার পাশে পাশে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে খাম আলুর বীচন লাগানো হয়। ৬০ সেমি. (দুই ফুট) লম্বা, ৬০ সেমি. (দুই ফুট) চওড়া এবং ৬০ সেমি. (দুই ফুট) গভীর গর্ত খুঁড়ে তাতে ১০ থেকে ১৫ কেজি. পচানো গোবর এবং ৪ থেকে ৫ কেজি. কাঠের ছাই ঢেলে ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হ'বে। বীচন লাগাবার মাস খানেক আগেই এ রকম গর্ত খুঁড়ে গোবর ও ছাই মিশিয়ে রাখা ভাল।

বপনের সময় ও নিয়ম ঃ

বর্ষা নামবার ঠিক আগে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই খাম আলুর বীচন গর্তে লাগানো হয়।

মাটির তলায় তিন চার বছর রাখা ভাল রকম পাকা খাম আলুর থেকেই খাম আলুর বীচন তৈরী করা হয়। বীচনের জন্য খাম আলুগুলি এভাবে টুকরো টুকরো করে কাটতে হ'বে, যেন প্রতিটি টুকরোতে অন্ততঃ দুটো থেকে তিনটে চোখ থাকে। টুকরোগুলি

খুব ছোট না হওয়াই ভাল। কুড়ি থেকে পঁচিশটি খাম আলুর টুকরোর ওজন এক কেজি. মত হ'বে। গোবরে খানিকটা জল মিশিয়ে কাই তৈরী করে প্রতিটি টুকরোতে ভাল করে সেই কাই মাখাতে হ'বে। তারপর একটা উঁচু জায়গায় গর্ত খুঁড়ে জমির সমতল থেকে ৫ সেমি. (দুই ইঞ্চি) নীচে প্রায় ৮ সেমি. (তিন ইঞ্চি) দূরে দূরে খাম আলুর টুকরোগুলি পুঁতে রাখতে হবে। পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যেই প্রতিটি টুকরো থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আসবে। অঙ্কুরিত খাম আলুর টুকরোগুলি এক মাস আগে তৈরী করা গর্তে লাগাতে হ'বে। ৬০ সেমি. (দুই ফুট) থেকে ৯০ সেমি. (তিন ফুট) দূরে দূরে এক একটি খাম আলুর গর্ত থাকবে। মাটির সমতল থেকে ১০ সেমি. (চার ইঞ্চি) নীচে অঙ্কুরিত খাম আলুর বীচনগুলি বসিয়ে ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

খাম আলুর গাছে যে ছোট ছোট আলুর মত ফল হয় সেগুলো লাগিয়েও খাম আলুর চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু এভাবে চাষ করলে খাম আলুর আকার বড় হয় না, তাই ফলনও কম হয়।

সার প্রয়োগ ঃ

সাধারণতঃ গোবর এবং ছাই ছাড়া খাম আলুতে কোনও সার দেবার প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি গাছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ গ্রাম এমোনিয়াম সালফেট দিলে ফলন ভাল হ'বে। তিন বারে এই সার দিতে হবে। লাগাবার মাস খানেক পর প্রথম বার এই সার দেওয়া দরকার। তারপর এক মাস পর পর আরও দু' বার।

জলসেচ ঃ

খাম আলু গর্তে লাগিয়েই জলসেচ দেওয়া প্রয়োজন। তারপর বৃষ্টি না হলে দশ বার দিন অন্তর অন্তর জল দিতে হবে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বেশি হয় বলে খাম আলুতে খুব কমই জল দেবার দরকার হয়।

পরিচর্যা ঃ

খাম আলুর বীচন গর্তে লাগাবার দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই চারা মাটির উপর বেরিয়ে আসে। লাগাবার তিন থেকে চার সপ্তাহ পর একবার গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার কিছুদিন পর প্রতিটি খাম আলুর চারার কাছে কঞ্চিসহ ১৮০/২১০ সেমি. (৬/৭ ফুট) উঁচু একটি করে বাঁশ পুঁতে দিতে হয়। খাম আলুর লতা একটু বড় হলেই লতাটিকে সেই বাঁশের উপর তুলে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হয় যাতে খাম আলুর লতা বাঁশ বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে পারে।

এর পর থেকে মাঝে মাঝে গাছের গোড়া পরিষ্কার করাই প্রধান পরিচর্যা। তাছাড়া বছরে তিন চার বার গাছের গোড়ায় মাটি উঁচু করে দিতে হবে।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

খাম আলুর কোনও রোগ বা পোকার আক্রমণ দেখা যায় না। তাই তার প্রতিকারের জন্যও কোনও ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন নেই।

ফসল তোলা ও ফলন ঃ

একটি গাছে একটি করেই খাম আলু হয়। ঠিকমত যত্ন নিয়ে চাষ করলে ছ' মাস পরেই এক একটি খাম আলু এক কেজি. মত ওজনের হয়। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে খাম আলুটি তুলতে হয়। ছ' মাস পরে তুললেই এক একর জমি থেকে ১০,০০০ কেজি. পর্যন্ত খাম আলু পাওয়া যেতে পারে। অনেক সময়ে দু' বছর মাটিতে রেখে খাম আলু তোলা হয়। তখন এক একটি খাম আলুর ওজন ১০ কেজি. পর্যন্ত হতে পারে। দু' বছরের খাম আলু থেকেই খাম আলুর বীচন তৈরী করা হয়।

সংরক্ষণ :

ভাল রকম পাকা খাম আলু দু' তিন দিন রোদে শুকিয়ে বাঁশের বা কাঠের মাচায় সাজিয়ে রাখলে সহজেই এক বছর পর্যন্ত ঘরে রাখা যায়। মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া ভাল। মাচা তৈরী করতে অসুবিধা হলে মেঝেতে ১৫ সেমি. (ছয় ইঞ্চি) পুরু বালি বিছিয়ে খাম আলু ছড়িয়ে রাখা যায়। কিন্তু এতে বর্ষাকালে কিছু খাম আলু পচে নষ্ট হতে দেখা যায়। একটা খাম আলু পচতে দেখা গেলেই সেটা সরিয়ে ফেলে খেয়ে ফেলতে হয়। নয়তো পচা খাম আলুর গায়ে লেগে অন্যগুলিতেও পচন ধরতে পারে।

শাঁক আলু

মাটির তলার যে সমস্ত ফসল আমরা সব্‌জি বা মসলা হিসেবে খেয়ে থাকি তাদের চাষের কথা শেষ হ'ল। আর এক রকমের ফসলও মাটির তলায় হয়। দেখতে অনেকটা সাদা রঙ এর মিষ্টি আলুর মত। এর নাম দেওয়া হ'য়েছে শাঁক আলু। দেখতে মিষ্টি আলুর মত হ'লেও এর স্বাদ একেবারে আলাদা। খোসা ছাড়িয়ে কাঁচা শাঁক আলু ফলের মতো খাওয়া হয়। পূজোর ফল হিসেবেও শাঁক আলু খুব ব্যবহার করা হয়। সব্‌জি বা তরকারি হিসেবে কিন্তু এটা অচল। শাঁক আলুর চাষ কম বেশি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সমতল এলাকার প্রায় সব জেলাতেই হয়।

আবহাওয়া ও মাটি :

যেখানে বৃষ্টিপাত বেশ বেশ এবং আবহাওয়া বেশ গরম থাকে সেখানেই শাঁক আলু ভাল হয়।

বেলে মাটি থেকে বেলে দোঁয়াশ মাটিতেই শাঁক আলু ভাল হয়।

তাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নদীর চরেই বেশি শাঁক আলুর চাষ দেখা যায়। অম্ল মাটিতে শাঁক আলু ভাল হয় না। তাই উত্তরবঙ্গের কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় এবং শিলিগুড়ি মহকুমায় এর চাষ কম। উঁচু জায়গা যেখানে জল দাঁড়ায় না সেখানেই শাঁক আলুর চাষ করা যাবে।

জমি তৈরী ঃ

বাড়ীর আশে পাশে বা পুকুরের ধারে, অথবা বাগানের বেড়ার পাশে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে শাঁক আলুর বীজ লাগানো হয়। নদীর চরে বেশি জায়গা জুড়েও কখনও কখনও শাঁক আলুর চাষ হয়। ৬০ সেমি. (এক ফুট) লম্বা, ৬০ সেমি. (এক ফুট) চওড়া এবং ৬০ সেমি. (এক ফুট) গভীর গর্ত খুঁড়ে প্রতিটি গর্তে ৫ কেজি. আবর্জনা পচা সার বা পুকুরের পাঁক এবং ২৫ গ্রাম সুপার ফসফেট মিশিয়ে রেখে দিতে হ'বে। শাঁক আলুর বীজ লাগাবার মাসখানেক আগেই এ ভাবে গর্ত খুঁড়ে সার মিশিয়ে রাখা ভাল।

বপনের সময় ও নিয়ম ঃ

বর্ষা নামবার ঠিক আগে অথবা বর্ষা নামবার সাথে সাথে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ অথবা আষাঢ় মাসে শাঁক আলুর বীজ লাগানো হয়। আমরা যে শাঁক আলুটি খাই সেটি একটি পরিবর্তিত মূল। সেই মূল লাগিয়ে শাঁক আলুর গাছ হয় না। শাঁক আলুর লতায় মাটির উপরে গজানো শুঁটিতে থাকে শাঁক আলুর বীজ।

মাসখানেক আগেই যে গর্ত তৈরী করে সার মিশিয়ে রাখা হ'য়েছে সেখানেই মাটির সমতলের ২½ সেমি. (এক ইঞ্চি) নীচে শাঁক আলুর বীজ বোনা হয়। সুস্থ, পুষ্ট বীজ বেছে নিয়ে বুনবার ২৪ ঘণ্টা আগে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরে সেই অঙ্কুরিত বীজের চারাটি প্রতি গর্তে প্রায় ৮ সেমি. (তিন ইঞ্চি) দূরে দূরে বুনতে হয়। বীজ বুনে ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে।

সার প্রয়োগ ঃ

শাঁক আলুর বীজ লাগাবার মাসখানেক আগেই প্রতি গর্তে আবর্জনা পচা সার এবং সুপার ফসফেট মিশিয়ে রাখতে হয়। সাধারণতঃ শাঁক আলুর গাছে আর কোনও সার দেবার প্রয়োজন হয় না। বর্ষা বেশি হ'লে বীজ বুনবার মাসখানেক পর ১০ কেজি. ঝুরঝুরে আবর্জনা পচা সারের সাথে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে প্রতি দশটি গাছের গোড়ায় দিলে গাছের জোর হয়। মনে রাখতে হ'বে একটি শাঁক আলুর গাছের জন্য পাঁচ গ্রামের বেশি ইউরিয়া দেওয়া চলবে না। আর তা দিতে হ'বে আবর্জনা পচা সারের সাথে মিশিয়ে।

কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় শাঁক আলুর চাষ করতে গেলে একর প্রতি ৪ কু. ৬৩ কেজি. (১৫ মণ) চুন দিতে হ'বে। শাঁক আলু জমিতে লাগাবার কমপক্ষে ছ'মাস আগেই চুন জমিতে মিশিয়ে দিতে হ'বে। ছ' বছর থেকে তিন বছর পর পর এরকম চুন দেওয়া প্রয়োজন।

জলসেচ ঃ

শাঁক আলুর বীজ লাগিয়েই জলসেচ দেওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টি না হ'লে বীজ লাগাবার পর চারা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত একদিন অন্তর জল দেওয়া প্রয়োজন। চারা বেরোবার পর সাত থেকে দশ দিন অন্তর জল দিতে হয়। অবশ্য বৃষ্টি হ'লে আর জল দেবার প্রয়োজন হয় না।

পরিচর্যা ঃ

শাঁক আলুর বীজ লাগাবার পর পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই মাটির ভেতর থেকে চারা বেরিয়ে আসে। লাগাবার তিন সপ্তাহ পর, একবার গাছের গোড়া পরিষ্কার করে প্রত্যেকটা গাছের গোড়ায়

মাটি দিতে হয়। গোড়ায় মাটি উঁচু করে দিয়ে তার চার পাশে গোল ক'রে গর্ত রাখা হয়। এক জায়গায় একটি সতেজ চারা রেখে বাকী তিনটি তুলে ফেলতে হয়। তার কিছুদিন পর প্রতিটি শাঁক আলু গাছের ঢিবির কাছে একটি কঞ্চি সহ ১৮০/২১০ সেমি. (৬।৭ ফুট) উঁচু বাঁশ পুঁতে দিতে হয়। শাঁক আলুর লতা একটু বড় হ'লেই লতাটিকে সেই বাঁশের উপর তুলে দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হয় যাতে শাঁক আলুর লতা বাঁশ বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে পারে। নদীর চরে শাঁক আলুর গাছের পাশে অনেক সময় পাট কাঠি বা শনের কাঠি দিয়ে বেড়া বেঁধে দেওয়া হয়। সেই বেড়া বেয়ে বেয়ে শাঁক আলুর লতা উপরে উঠে।

প্রথমবার শাঁক আলু গাছের গোড়া পরিষ্কার করবার পর প্রয়োজন হ'লে আরও ছ'বার আগাছা পরিষ্কার ক'রে মাটি উঁচু ক'রে দিতে হ'বে।

রোগ ও কীটশত্রুর প্রতিকার ঃ

শাঁক আলুর গাছে সাধারণতঃ কোনও রোগের আক্রমণ দেখা যায় না।

মাঝে মাঝে এক রকম শুঁয়ো পোকার আক্রমণে শাঁক আলুর গাছের ক্ষতি হয়। এই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ডেমিক্রন, মেটাসিড, রোগোর অথবা মেলাথায়ন নামক তরল ওষুধ ব্যবহার করতে হ'বে। প্রতি ৩ লিটার জলে এক মিলিলিটার ডেমিক্রন, অথবা দুই মিলিলিটার মেটাসিড, অথবা তিন মিলিলিটার রোগোর অথবা পাঁচ মিলিলিটার মেলাথায়ন মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ছিটাতে হ'বে।

ফসল তোলা ও ফলন ঃ

বীজ লাগাবার ছয় মাস পর অর্থাৎ পৌষ মাস নাগাদ শাঁক আলু তোলবার উপযুক্ত হয়। অগ্রাণ মাসের শেষ দিকেই গাছের পাতা

শুকোতে আরম্ভ ক'রে। যে গাছ থেকে বীজ রাখা হ'বে সে গাছ শুকোলে পরেও দু'সপ্তাহ মাঠে রাখতে হ'বে। অন্য গাছগুলির পাতা শুকোতে আরম্ভ করলেই কোদাল দিয়ে গাছের গোড়া খুঁড়ে শাঁক আলু তুলতে হ'বে। প্রতিটি গাছে মাটির তলায় তিনটি থেকে পাঁচটি শাঁক আলু হয়। একটি গাছে গড়ে ৫০০ গ্রাম শাঁক আলু হয়। ভাল রকম যত্ন নিয়ে চাষ করলে প্রতিটি গাছ থেকে এক কেজি. শাঁক আলু পাওয়া যেতে পারে। এক একর জমিতে শাঁক আলু চাষ করলে ৫,০০০ কেজি. থেকে ১০,০০০ কেজি. ফলন পাওয়া যাবে।

সংরক্ষণ :

শাঁক আলু সংরক্ষণ করে রাখাই খুব অসুবিধাজনক। ঘরে রাখলে এক মাসের মধ্যেই এর ভেতরের রস শুকিয়ে যায়। তাই খেতে আর মোটেই স্বাদ লাগে না। ঘরে রাখলে নানা রকম ছত্রাকের আক্রমণেও শাঁক আলুর ক্ষতি হয়।

হিমগুদামে শাঁক আলু রাখলেও তার স্বাদ নষ্ট হয়। কারণ, যতদিন রসালো থাকে ততদিনই শাঁক আলুর কদর।